ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা ।। ২ শ্রাবণ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৯ জুলাই, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

কলকাতায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তীতে আহ্বান

'ভিশন'-এর অভাবেই দেশভাগ, সর্বাগ্রে চাই স্বার্থত্যাগ : শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "আজই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। দেশের জন্যই বাঁচব, দেশের জন্যই মরব। দেশ, রাষ্ট্র সর্বোপরি— তার উপরে আর কিছু নয়। স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে, কমপক্ষে স্বার্থের মাত্রা কম তো করতেই হবে। দেশের তাবৎ সমস্যার মূলে রয়েছে স্বার্থ। বিগত ১০০০ বছরের ইতিহাসে আমরা সদা সর্বদা লড়াই করেছি। কখনও হারিনি, পরাজিত হইনি। ১৯৪৭ সালেই প্রথম পরাজয় হয়েছিল যেদিন আমরা দেশভাগ স্বীকার করে নিয়েছিলাম।" গত ১১ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতার মহাজাতি সদনের উপচে পড়া সভাগারে উপরোক্ত মন্তব্য করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। এদিনকার সভার প্রধান বক্তা ছিলেন তিনি এবং বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মোহনরাও ভাগবত ও নীতিন গডকরি। এরপর সম্পূর্ণ বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গাওয়ার সময় সবাই উঠে দাঁড়ান। গানটি গান শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনায় মোহন ভাগবত ও নীতিন গডকরি। সঙ্গে কে কে গাঙ্গুলি ও তরুণ বিজয়। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

এদিনের সভার আলোচ্য বিষয়টি আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল— 'ভারত ২০২০—যুব সমাজের প্রতি আহ্বান'। দু'জন বক্তাই বিষয়বস্তু ও সময়সীমার মধ্যেই মাপা লেংথ এবং নিশানায় নিজেদের বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন। শ্রীভাগবত বলেন, পরাজয়ের কারণ 'দৃষ্টি'র অভাব, 'ভিশন' ছিল না। আমাদের ভারতবর্ষ দেশ নয়— শুধু মাটি, বালি, পাহাড়, নদীর সমষ্টি মাত্র নয়, চিন্ময়ী মাতৃভূমি। এই অনুভূতি বা দৃষ্টি থাকলে দেশকে কেউ ভাগাভাগি করত না।

শ্যামপ্রসাদ ছিলেন ব্যতিক্রম। দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী দেখে যতটা বাঁচাতে পারতেন ততটা বাঁচিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে অবশিষ্ট কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে রেখে গিয়েছেন। উনি উপলব্ধি করতেন দেশ এক। সেজন্যই স্লোগান দিয়েছেন— এক দেশ মেঁ দো নিশান, দো বিধান; দো প্রধান— নহী চলেঙ্গে, নহী চলেঙ্গে।

শ্রীভাগবত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষত যুবক শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, গত ৬৩ বছরে অখণ্ড ভারত থেকে আলদা হয়ে যাওয়া আফগানিস্তান, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের যে কী হাল হয়েছে তা আজ সবাই দেখতে পাচ্ছেন। সেজন্য কয়েকবছর আগে ঢাকায় সার্ক-বৈঠকে তৎকালীন সার্ক সভাপতি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি প্রেমদাসা বলেছিলেন, "ছোট ছোট কথায় (বাবরি ধাঁচা ধ্বস্ত হওয়াকে উদ্দেশ্য করে) ঝগড়া মনোমালিন্য ঠিক নয়। মানচিত্রে আলাদা হলেও আমরা প্রকৃতপক্ষে এক।" রাজনীতি করার জন্যই সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়। শ্রীভাগবতের বক্তব্য—দেশের জন্যই বেঁচে থাকা, দেশের জন্যই মৃত্যুকে বরণ করা। এই ব্রত নিয়ে চললে ভারত আবার বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবে।

সভার সভাপতি মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে কে গাঙ্গুলী তাঁর ভাষণে বলেন, শ্যামাপ্রসাদকে যথাযোগ্য সম্মান না জানিয়ে আমরা বাঙালীরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলার মতো পাপ আর হয় না। যিনি অখণ্ডভারত চেয়েছেন তিনি কিভাবে অহিন্দুদের বিরোধী

(এরপর ৪ পাতায়)

লাল দুর্গের নিরাপদ আসনেও বড় ফাটল

গুঢ়পুরুষ।। দুর্গাপুর-১ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে জয় সিপিএমকে চাঙ্গা করতে পারেনি। উল্টে গতবারের জয়ের নিরীখে এবার প্রায় ৩২ হাজার ভোট কমায় পার্টির কমরেডরা বেশ ঘাবড়েই গেছে। কারণ, এই আসনটি দুর্গাপুরের লাল দুর্গের প্রধান নিরাপদ আসন। এখানে বিরোধীদের কোনও সংগঠন নেই বললেই চলে। তাই তৃণমূল ও তার দোসর কংগ্রেস কেউই এই হারা আসনে প্রার্থী দিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। দুই দলেরই নেত্রী-নেতারা "আপ পহেলে—আপ পহেলে" কায়দায় একে অপরকে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন।

দুর্গাপুর উপনির্বাচন

বিরোধী জোট নেতৃত্ব স্বপ্নেও ভাবেনি যে সিপিএমের এমন একটি অতি নিরাপদ আসনে এতটা বড়সড় ফাটল ধরেছে। এই খবরটি জানা থাকলে আসনটিতে দলীয় প্রার্থী দিতে জোরাজুরি কামড়াকামড়ি করতো।

দুর্গাপুরের উপনির্বাচনের জয় স্বাভাবিকভাবেই পার্টির কমরেডদের উল্লসিত করেনি। লাল দুর্গের "অতি নিরাপদ" আসনে যদি এমন হাল হয় তবে দক্ষিণবঙ্গের কোনও একটি আসনও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপদ নয়। পার্টির

(এরপর ৪ পাতায়)

ছত্তিশগড়ে 'নিরাপদ আশ্রয়ের' সন্ধানে মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রেড করিডরের মধ্যেও রেড করিডর গড়ে তোলার চেষ্টা। এই কাজে মাওবাদীদের টার্গেট ছত্তিশগড়। ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড়কে কেন্দ্র করে 'সেফ হেভেন' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছে মাওবাদীরা। সাম্প্রতিককালে নাগপুরের চন্দ্রাপুর জেলা-পুলিশ বান্দু মেশ্রাম নামে জনৈক মাওবাদীকে গ্রেপ্তার করেন। তার কাছ থেকে পাওয়া যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, মেলে শীর্ষ মাও-নেতৃত্বের সঙ্গে বান্দুর যোগাযোগের প্রমাণ। ধরা পড়া মাওবাদীকে জেরা করে পুলিশ জেনেছে, পূর্ব বিদর্ভ থেকে নাগপুরের পেঞ্চ ন্যাশনাল পার্কের মধ্যবর্তী ভাণ্ডারা-গোন্ডিয়া-বালাঘাট জংশন এবং নাগজিরা ওয়াইল্ড স্যাংচুয়ারি হয়ে সিওনি জেলায় তাদের নতুন ঘাঁটি গাড়তে চলেছে মাওবাদীরা। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছে, মহারাষ্ট্র সরকারের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির কেন্দ্রস্থল আর এস এসের প্রধান কার্যালয়কে ঘিরে মাও-বলয় তৈরির কৌশল অব্যাহত রয়েছে। সেইসঙ্গে মাওবাদীদের আরেকটা কৌশল হলো, এই সমস্ত জায়গায় ঘাঁটি তৈরি হলে সরকার যদি কখনও তাদের গড় অবুঝমাড়ে অভিযান চালায়, তবে জরুরি ভিত্তিতে তাদের নয়া ঘাঁটি থেকে লোক ও অস্ত্রশস্ত্র সাপ্লাই করা যাবে। প্রসঙ্গত, ঘনজঙ্গল যুক্ত কয়েকটি অঞ্চল যেমন পেঞ্চ (মধ্যপ্রদেশের সিওনি-তে অবস্থিত), রামটেক (নাগপুর-ভাণ্ডারা রোড), নাকাডোঙ্গারি, বেপারা এবং মাদাগি (এই তিনটিই ভাণ্ডারা জেলায়) এমনিতেই পুলিশের কাছে দুর্ভেদ্য। ধৃত মাওবাদীটি জেরায় জানিয়েছে, তাদের দণ্ডকারণ্য বিশেষ জোনাল কমিটি ওই সমস্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৫-৩০ জন মাওবাদী ক্যাডারকে পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে অধুনা অবলুপ্ত নাগজিরা দালামের কম্যাণ্ডার শিবাজী তুমারেড্ডি আত্মসমর্পণ করেন। তারপর থেকেই ধাপে ধাপে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে মাওবাদীদের। কিন্তু তাদের এতটা বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে সম্প্রতি। এর জন্য এলাকাবাসী মহারাষ্ট্র সরকারের পুলিশী নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করছেন। কিছুদিন আগেই গোণ্ডিয়া সংলগ্ন বালাঘাটের লানজি, করকা ইত্যাদি এলাকায় বন দপ্তরের কিছু কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় মাওবাদীরা। সি পি আই (মাওবাদী) শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের ক্যাডারদের বলেছে, অদূর ভবিষ্যতে

(এরপর ৪ পাতায়)

দ্বিতীয় দান্তেওয়াড়ার আশঙ্কায় বুদ্ধগয়ার সি আই এ টি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাঠ-সমস্যায় ভুগছে দেশের প্রথম জেহাদী ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রশিক্ষণ শিক্ষাকেন্দ্র কাউন্টার ইনসারজেন্সী অ্যান্ড অ্যান্টি টেররিস্ট ট্রেনিং স্কুল (সি আই এ টি)। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের পেছনের দিকে রাজ্য পুলিশের বাহিনীকে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিহার পুলিশের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে, শুরু হয়ে গেছে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রস্তুতিও। মূলত জেহাদী প্রতি আক্রমণের কলাকৌশল থেকে শুরু করে, গেরিলা যুদ্ধ ও নকশাল-হামলা রোখার যাবতীয় কৌশল প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এখানে। প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র গড়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে টালবাহানা করলেও শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছেন। কারণ বিহারের ৩৮টি জেলার মধ্যে ৩০টি জেলাই নক্সাল অধ্যুষিত বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে।

কিন্তু বর্তমান সি আই এ টি-র এই কেন্দ্রটিতে স্থান অর্থাৎ মাঠের সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে আধিকারিকেরা জানিয়েছেন। যে মাঠে পুলিশবাহিনীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা এতই ছোট যেখানে 'ফায়ারিং রেঞ্জ' (গুলি চালনার দূরত্ব) একপ্রকার নেই বললেই চলে। তার ওপরে আট সপ্তাহের এই কোর্সটি আধুনিক বিভিন্ন অস্ত্র-সরঞ্জামের কথা 'থিওরিটিক্যাল' ক্লাসে বলা হলেও, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে সেই মান্ধাতার আমলের উপকরণ দিয়েই ব্যবহারিক শিক্ষা সারতে হয়েছে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত পুলিশ কর্মীদের। এমনকী, আধুনিক গ্রেনেড, ইম্প্রোভাইসড ইলেকট্রিক্যাল ডিজাইস (আই ই ডি) বা ডিটোনেটার না পেয়ে কাল্পনিক শত্রুর দিকে স্রেফ পাথর ছুঁড়েই শেষ করতে হয়েছে প্রশিক্ষণ।

(এরপর ৪ পাতায়)

আফগানিস্তান নয়, পাকিস্তান নয়, সেকুলার ভারতে কমিউনিস্ট শাসিত রাজ্যে হাত কেটে নেওয়া হল

বিশেষ প্রতিনিধি।। টি. জি. যোশেফ— কেরলের থোজুপুজাহ্ নামক স্থানে ক্যাথলিক খৃষ্টান সংস্থা দ্বারা পরিচালিত 'নিউম্যান কলেজে' মালয়ালম্ ভাষার প্রফেসর। তাঁকে হাজতবাস করতে হয়েছে, চাকরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত হতে হয়েছে— এমনকী দুর্বৃত্তদের অস্ত্রে তার ডান হাতটিও খোওয়াতে হয়েছে। যোশেফ কোনও দাগী অপরাধী নন্, যোশেফ্ কোনও সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেননি, যোশেফ্ কারো হাত কেটে নেবার চেষ্টা করেননি। তার একমাত্র 'অপরাধ' ছিল—তিনি এমন একটি প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন যা মুসলিম সম্প্রদায়ের গুটিকয়েক মানুষের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। যারা প্রশ্নপত্রের একটি অংশ আপত্তিকর মনে করেছিলেন তারা আদালতের সিদ্ধান্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া শাস্তি ইত্যাদির ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই তারা নিজেরাই ওই প্রফেসরকে শাস্তি দিয়েছে। সে শাস্তি হলো— যোশেফের মা-বোনের চোখের সামনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ডান হাত কেটে নেওয়া হলো— যে হাত যোশেফকে 'প্রফেসর' তৈরি করেছিল।

হাসপাতালে আহত যোশেফ।

প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী কলেজের অভ্যন্তরীণ একটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একটা রচনাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছিল যেখানে কাল্পনিক সংলাপের দুটি চরিত্রের নাম ছিল ঈশ্বর ও মহম্মদ। যোশেফ মূল রচনাংশটির একটি চরিত্রের নাম বিকৃত করে— মহম্মদ করেছিলেন। এটি হয়তো তার করা উচিত হয়নি। কিন্তু যদি কোনও প্রশ্নকর্তা প্রশ্নপত্রে কোথাও লেখেন— চুরির দায়ে রামের জেল হলো— তবে কি ধরে নিতে হবে এ 'রাম' অবতার শ্রীরাম! যারা যোশেফের হাত কেটে নিয়েছে তারা কোনওকালে কোনও যুক্তির তোয়াক্কা করেনি—এখনো করে না। পরীক্ষা হয়েছিল এপ্রিল মাসে। যোশেফের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। যোশেফ এখন জামিনে মুক্ত ছিলেন। এদিকে একই 'অপরাধে' সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় যোশেফকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। এপ্রিল মাসে ওই প্রশ্নপত্রকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছিল— থোজুপুজাহ্। এমনকী একটি মন্দিরও আক্রান্ত হয়!

৪ জুলাই রবিবার, গীর্জা থেকে প্রার্থনা সেরে ফিরছিলেন যোশেফ। গাড়িতে সঙ্গী ছিল তার মা ও বোন স্টেলা যোশেফ। দুর্বৃত্তের দল রাস্তার মাঝে গাড়ি থামিয়ে যোশেফ-কে টেনে বের করে আনে। সেই সঙ্গে চলে বোমা বৃষ্টি। যোশেফের মা ও বোনকে গাড়িতে আটকে রাখা হয়। যোশেফের ডান হাতটি কেটে নিয়ে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ফেলে রেখে পালায় দুর্বৃত্তেরা। যোশেফ আগেই পুলিশকে তার ওপর আক্রমণের আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল। পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে কর্তব্য সেরেছে। কেরলের বামপন্থী সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এম. এ. বেবি বলেছেন— সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এটি একটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ।

ঘটনাটি কেরলে ঘটেছে— গুজরাট বা মধ্যপ্রদেশে ঘটেনি। তাই বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কাগজগুলোতে এখবর বেরোয়নি। কলকাতার শিক্ষাবিদ্, বুদ্ধিজীবী, মানবতাবাদী, বিশিষ্ট নাগরিক—কেউই কিছু বলেননি। এমনকী কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো তথাকথিত বামবিরোধী দলগুলিও কেরলে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের' দায় চাপিয়ে দেয়নি। এর থেকেও মজার কথা খৃস্টান মিশনারীদের বিভিন্ন সংগঠন কিংবা ভ্যাটিকানের প্রতিনিধিরাও এখনও পর্যন্ত নিশ্চুপ!

বেচারা যেশেফ! ধর্মপ্রাণ খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও তার পারিবারিক শান্তি খোওয়াতে হলো, চাকরী খোওয়াতে হলো অথচ, পেলেন না কোনও নৈতিক সমর্থন বা সহানুভূতি। কারণ একটাই— তা হলো আক্রমণকারীদের কোনও হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়নি। প্রতিবাদের সব কণ্ঠ চুপ করে গেছে কারণ ঘটনাটি গুজরাট বা মধ্যপ্রদেশে ঘটেনি। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করা হয়নি কারণ সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম দলের, বিজেপি-র নয়! যে কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। আক্রমণকারী বা আক্রান্তর উপাসনা-পদ্ধতি যেন প্রতিবাদের ভাষাকে প্রভাবিত না করে।

এই সময়

রাজনৈতিক সামাজিকতা

যখন কোনও রাজনৈতিক দল তাদের সরকারি নথিভুক্তকরণ করাবে তখন তাকে 'সামাজিকতা' বিষয়টিতে অবশ্যই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। এর বিরুদ্ধে ওঠা একটি পি আই এল খারিজ করে এমনই অভিমত জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এইচ কাপাডিয়া-র নেতৃত্বে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, ১৯৭৫-৭৭-এ জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নথিভুক্তকরণের সময় 'সামাজিকতা' শব্দটি অ্যাজেন্ডার মধ্যে ঢোকানো আবশ্যিক করা হয়েছিল। একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইনজীবী ফলি এস নরিম্যান আদালতে বলেন— 'সামাজিকতা' শব্দটি রেজিস্ট্রেশনে থাকলে তা 'আদতে ভুল' হবে। তাঁর এই যুক্তি মানেনি সুপ্রিম কোর্ট।

প্রতিবাদে সেনা

আর্মড ফোর্সেস ট্রাইব্যুনালের আদেশ, কার্গিল যুদ্ধের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে, একে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাল ভারতীয় সেনাবাহিনী। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু কার্গিল যুদ্ধের সময়কার বাতালিক কেন্দ্রিক ৭০ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কম্যান্ডার দেবিন্দর সিং-এর করা মামলার ওপর ভিত্তি করে সেনা আদালত ওই রায় দেন। এই রায়কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সেনাবাহিনী বলেছে, তাদের লেখায় কোনও অতিরঞ্জন নেই। নেই কোনও অর্থহীন কথা, মিথ্যে বর্ণনা বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনও ইতিহাস।

পেছনে লাগা

এইভাবে কোনও ভদ্রলোকের পেছনে কেউ কখনও লাগতে পারে, বলুন? না হয় পুলিশের ডান্ডার ভয় দেখিয়ে মোক্ষম জমিটা হাতাতেই গেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে বলে এইভাবে ল্যাজে-গোবরে করে ছেড়ে দেবে! আজকে নিজের পার্টির রেজ্জাক মোল্লা সাহেব হুমকি দিচ্ছেন যে তিনি আর ভোটে দাঁড়াবেন না (কারণ পার্টির একাংশ তাকে চাইছেন না), তো কালকে 'সিপিআই-এর কারাট' মানে এবি বর্ধন বলছে, জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকারের নীতি ছিল ভ্রান্ত। এহেন সমালোচনায় ক্ষুব্ধ বুদ্ধবাবুর মনোবাসনা—২০১১-য় আর ভোটে দাঁড়াবেন না (কারণ দাঁড়ালেই তো হার নিশ্চিত)। কিন্তু তাতেও এই পেছনে লাগার স্বভাবটা নিজের পার্টির আর শরিকদলের নেতাদের যাবে তো? —এটাই বোধহয় জিজ্ঞাস্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের!

বিপদ বুঝে

২০০৮-এ ব্যাঙ্গালোর ধারাবাহিক বিস্ফোরণ কান্ডে অন্যতম অভিযুক্ত আব্দুল নাসের মাদানি আগাম জামিনের আবেদন করেছেন তিরুবনন্তপুরমস্থিত কেরল উচ্চ-ন্যায়ালয়ে। গত ১২ জুলাই তিনি এই আবেদন করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এনিয়ে পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য হয়েছে ১৪ জুলাই। মাদানি আগাম জামিন পাবে কিনা সেটা সময়-ই বলবে। কিন্তু তার আগাম জামিন মানে যে বিচার-ব্যবস্থায় প্রহসনের প্রসঙ্গ উঠবে, সে-কথা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক নেতাদের দাক্ষিণ্যে এতকাল বহু মানুষ খুন করেও নির্ভীক চিত্তে জেলের বাইরে রয়েছে মাদানি। এখন দেখার, রাজনীতির থাবা দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কতটা গ্রাস করেছে বা আদৌ করেছে কি না!

মসজিদ চত্বরে অস্ত্র

গত ১২ জুলাই কেরলের কান্নুর জেলার এদাক্কাদ অঞ্চলের একটি মসজিদ চত্বর থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক ও অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদাক্কাদ অঞ্চলে একের পর এক অস্ত্র বোঝাই গাড়ি ধরা পড়েছে সাম্প্রতিককালে। বোঝাই যাচ্ছে অস্ত্র-বারুদের ওপর বসে রয়েছে এদাক্কাদ। মুসলিম মৌলবাদীদের শক্ত ঘাঁটি এদাক্কাদে মসজিদও নিরাপদ নয়। আবার এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই তারা হামলার ছক কষে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে এদাক্কাদের মসজিদ চত্বরে ঠিক কি উদ্দেশ্যে অস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল তা পুলিশের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন

দেশের অর্থনীতি যে মনমোহন সরকারের ধাপ্পাবাজির ওপর ভরসা রেখেই চলছে তা প্রমাণিত হলো শিল্প-বৃদ্ধি হারের (ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ রেট) অকস্মাৎ অবনমনে। গত সাত মাস ধরেই শিল্প-বৃদ্ধি হার একবারেই বাড়ছিল না। ইউ পি সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক কৌশলের ঠেলায় ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এমাসের শেষে সুদের হার কমানোর কথা যেই না ঘোষণা করেছে অমনি এপ্রিলের শিল্প-বৃদ্ধির ১৬.৫ শতাংশ হার মে-তে এসে ঠেকল ১১.৫ শতাংশে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছে, সরকার বিশ্ব-মন্দার বাজারে অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে যা করছে তাতে আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ডটাই।

আইনী যুদ্ধে বে-আইনী কারবার

যতীন থাক্করের বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছেন পাওনাদারেরা। কারণ ক্রিকেট-বেটিং (জুয়া)-এ বহু কোটি টাকা বাজি হেরে গা ঢাকা দিয়েছেন যতীন। ভাবছেন বুঝি জুয়া তো নিষিদ্ধ, পাওনাদাররা জেনেশুনে বাঘের গুহায় (মানে পুলিশের ডেরায়) ঢুকতে গেল কেন? এবার বোধহয় পুলিশ তাদের ঘ্যাঁক করে ধরবে। বিলকুল ভুল ভাবছেন। হোক না জুয়া নিষিদ্ধ, সব পেমেন্ট তো হয় চেকে। সুতরাং সবকিছুই আইনত সিদ্ধ! এহেন অবোধ ও শিশুর-সারল্যমাখা (!) যুক্তি সাজিয়ে যতীনের চেক কেন বাউন্স হলো তা নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ ক্রিকেট-জুয়ার কারবারীরা।

প্রধান বিচারপতির দাবী

অর্থের দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে হচ্ছে দেশের প্রধান বিচারপতিকেও। সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি এস এইচ কাপাডিয়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে ট্রায়াল কোর্টের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য ৯.৫৭৭ কোটি টাকা চেয়েছেন। এনিয়ে একটি ব্লু-প্রিন্টও তৈরি করেছেন তিনি। তাতে দেখা যাচ্ছে পড়ে থাকা মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পরিকাঠামো তৈরির কারণে আড়াই কোটি টাকা এবং সামগ্রিক অতিরিক্ত গ্রান্ট হিসাবে ৭.০৭৭ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতির দাবী বলে কথা, সরকারের না মেনে উপায় আছে? তবে কাজ কতটা হবে, বলা মুস্কিল।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর আবার অশান্ত কেন?

'কাশ্মীর অশান্ত' ইহা নতুন কিছু নয়। এটি কোনও খবরও নয়। ইহা ভারতবাসী মাত্রই জানেন। তবে ইহা অস্বীকার করিবার মতো ঘটনাও নহে যে একমাত্র বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলেই কাশ্মীর শান্ত ছিল। সাধারণ মানুষ পথে-ঘাটে সোচ্চারে সেইকথা বলিয়াও থাকেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নৈসর্গিক প্রকৃতি পিপাসু জনগণ কাশ্মীর ভ্রমণ শুরুও করিয়াছিল। কিন্তু আপাদমস্তক মুসলিম তোষণকারী সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস যে মুহূর্তে পুনরায় ক্ষমতায় আসীন হইয়াছে ২০০৪ সালে, সেই মুহূর্ত হইতেই শুধু কাশ্মীর নহে, সারা দেশের এমনকী পাকিস্তানসহ সমগ্র মুসলিম দেশগুলির সন্ত্রাসবাদীরাই কেমন যেন নড়িয়া বসিয়াছে। ভাবখানা এমন যে তাহাদের মন-মতো সরকারই হিন্দুস্থানে ক্ষমতায় বসিয়াছে।

সেই কংগ্রেস সরকারই ২০০৯ হইতে পুনরায় ক্ষমতায় বসিয়াছে পরপর দ্বিতীয়বারের জন্য। ২০০৮ সালের অমরনাথের শ্রাইন বোর্ডের জমি হস্তান্তর লইয়া জম্মুতে যে গণ আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মে যেন নিয়ম করিয়া অশান্ত হইয়া ওঠে কাশ্মীর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকে যেভাবে পুঁজি করিয়া কাশ্মীরকে অশান্ত করিয়া তোলা হইতেছে, তাহা একথাই প্রমাণ করিতেছে যে এই সকল ঘটনা পরিষ্কার পরিকল্পনার ফসল।

২০০৮ সালের অমরনাথের জমি আন্দোলনে কমপক্ষে ৬০ জন মানুষের প্রাণ গিয়াছিল, অথচ তাহার পরে পরেই যে বিধানসভা নির্বাচন হইয়াছিল, কংগ্রেসী সেবক পত্র-পত্রিকাগুলির মতে, তাহা নাকি এক ঐতিহাসিক, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ছিল। সেই নির্বাচনে ভোট পড়িয়াছিল নাকি ৬০ শতাংশ।

২০০৯ সালে কাশ্মীরের সোপিয়ানে দুই জন নারীর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাকে লইয়া কাশ্মীরকে অগ্নিগর্ভ করিয়া তোলা হয়। যথারীতি আক্রান্ত হয় সি আর পি এফ জওয়ানগণ। চলে বিরামহীন ইষ্টক বর্ষণ। ঘটনা যেটুকু ঘটিয়াছিল মুসলিমপ্রেমী পত্র পত্রিকাগুলি তাহাকে চতুর্গুণ করিয়া বর্ণনা করিয়া পরিবেশকে অগ্নিগর্ভ করিতে ইন্ধনও জোগাইয়াছিল। গ্রীষ্ম সমাপ্ত হইয়া আসিলে কেন জানি না কাশ্মীর ধীরে ধীরে শান্তও হইয়া পড়ে।

২০১০ সালের গ্রীষ্ম পড়িতে পড়িতেই জুন মাসে শুরু হইয়া গিয়াছে পুনরায় অশান্তি। এইবার বিষয় তোফায়েল মাট্টুর মৃত্যু। তাহার বয়স ১৭ বছর। এই ঘটনাকেও সুড়সুড়ি দিয়াছিল ওই সকল পত্র-পত্রিকাগুলিই। পুলিশই না কি ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করিয়া মারিয়াছিল তাহাকে। কিন্তু আসলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল উন্মত্ত জনতাকে প্রতিরোধ করিতে ছোঁড়া টিয়ার গ্যাস সেলে। সি আর পি এফ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে যে ইহা ছাড়া সংখ্যাধিক্য মানুষকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় ছিল না।

মাট্টুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া আরও মৃত্যুর মিছিল হইয়াছে। ১১ জুনের পর হইতে অন্ততঃ ১৫ জন প্রাণ হারাইয়াছে।

এইসব কাণ্ডই সারা গ্রীষ্ম জুড়িয়া চলিতেছে। ইহা কি কাকতালীয় ব্যাপার? তবে এইসবের মূল লক্ষ্য হইল কিন্তু ভারতীয় জওয়ান, যথেচ্ছ ইষ্টক বর্ষণ তো আছেই। তাহার পর মাঝে মাঝে বাহিনীর উপর সশস্ত্র আক্রমণ। সেই আক্রমণে বাহিনীর জওয়ানগণ নিহত হইলেও পত্র-পত্রিকাগুলির কিন্তু কিছুই যেন যায় আসে না। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকাগুলিতেই এমন সব খবর বাহির হইয়া পড়ে যাহার মাধ্যমে জনগণ জানিতে পারে যে এই সমস্ত ঘটনার পিছনেও রহিয়াছে সন্ত্রাসবাদ—রপ্তানিকারক পাকিস্তানই। এই কিছুদিন পূর্বেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে 'ফোন কল'। যাহা করা হইয়াছিল পাকিস্তান হইতে। তাহাতে ছিল নির্দেশ—ভারতে অশান্তি সৃষ্টির নির্দেশ। মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটনার সময়ও ঠিক এইরকম 'ফোন কলই' ধরা পড়িয়াছিল। মুসলিমপ্রেমীরা এবং কংগ্রেসীরাও এসব ঘটনা লইয়া চুপচাপই থাকা পছন্দ করে। কারণ সময়মতো মৌন থাকাটাতো রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যেই পড়ে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

একবার একটি কলেজের প্রাণীবিদ্যা শাখার ছাত্ররা তাদের বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে তামাশা করার মতলব এঁটেছিল। তারা একটা জলপোকা তথা water bug-এর পা-গুলো ছিঁড়ে তার জায়গায় আলাদা একটা প্রাণীর পা জুড়ে দেয়। তারপর সেটিকে ওই অধ্যাপকের কাছে নিয়ে গিয়ে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করে—আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না কিরকম নতুন ধরনের ছার-পোকা এটা। বৃদ্ধ অধ্যাপক পোকাটিকে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে পরীক্ষা করলেন এবং পরে গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—এটা কি রকম, তোমরা এ হেন একটা সরল সাধারণ পোকাও চেন না? এই Bug বা ছারপোকার নাম Humbug।

এই 'হামবাগ' ধরনের জাতীয়তাবাদকেই প্রাণবন্ত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। একটা বাঁদরের মাথা, মোষের পা ও হাতির শুঁড় জুড়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী তৈরীর চেষ্টার মতো। এর ফলে তো কেবল একটা ভীষণাকার শবই পাওয়া যাবে, কোনও জীবন্ত দেহ পাওয়া যাবে না! যদি ওই দেহে আদৌ কোনওরকম নড়াচড়া দেখা যায়, তাহলে সে ওই পচনোন্মুখ মৃতদেহে জন্মানো কীটানু ও জীবাণুর কারণেই।

আর বর্তমানে কি না সেইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের স্বাভাবিক সজীব জাতীয়তাবাদকে ছেড়ে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অস্বাভাবিক, অবৈজ্ঞানিক ও প্রাণহীন সংকর তত্ত্বের পিছনে ছুটছি বলে দুর্নীতি, অসংহতি ও অসংযত জীবনযাত্রার জীবাণু আমাদের জীবনীশক্তিকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

—শ্রী গুরুজী

পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার ও বাজার অর্থনীতির সম্পর্ক কতটুকু?

এন সি দে

সাম্প্রতিক পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি কথা বাজারে ছাড়া হয়েছে। একটি হচ্ছে মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ এবং আর একটি হচ্ছে বাজার অর্থনীতি চালু। মূল্য বিনিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে সরকারি তৈল কোম্পানীগুলোর তেল বিক্রি করার উপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া আর বাজার অর্থনীতির মানে হচ্ছে এমন এক অর্থনীতি যা বাজারের মর্জির উপর চলে। চাহিদা, সরবরাহ ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল এক সদা পরিবর্তনশীল বাজার। ঠিক যেমন এখন ঘটছে উড়ো জাহাজের টিকিটের দাম নিয়ে। একই উড়ো জাহাজে একই জায়গায় যাচ্ছে অথচ বিভিন্ন যাত্রীর টিকিটের ভাড়া বিভিন্ন। কেউ ছ-মাস আগে টিকিট কেটেছে তার লেগেছে হয়ত দু-হাজার টাকা, কেউ কেটেছে দু-দিন আগে তার হয়ত লেগেছে ৬-৭ হাজার টাকা; কেউ বা আবার দু-ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে গিয়ে কেটেছে, তার হয়ত আরও কম লেগেছে টিকিটের দাম। এই হচ্ছে বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যে অর্থনৈতিক জীবনে শুধুই অনিশ্চয়তা। একদল সময় সুযোগ মতো লুঠছে, আর একদল লুণ্ঠিত হচ্ছে। এখানে বিকাশ আছে, কিন্তু তা অসম। যার হাতে উৎপাদনের উপকরণ আছে, আবার অপরিমিত পুঁজি আছে, সে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আবার বিজ্ঞাপনী চাতুরীতে চাহিদাও বাড়ায়। বিজ্ঞাপনী প্রচারে নারীকেও করে তোলে পণ্যময়ী।

বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলি সরকারি আনুকূল্য পাওয়ার জন্য সরকারের এই কাজকে 'সাহসী পদক্ষেপ' বলে প্রচার করছে। যেখানে কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রের কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউ. পি. এ সরকারের কোনও পণ্য-মূল্যের উপরই নিয়ন্ত্রণ নেই;দিনে-রাতে জিনিসের দাম বাড়ে, সেখানে পেট্রলের মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার মধ্যে সাহসিকতা কোথায় বোঝা মুশকিল; শুধু এটুকু বোঝা যায় যে এই প্রচারের দ্বারা সরকারি দলের চামচাগিরিটা ভালই হয়। আর একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবী অর্থনীতিবিদ প্রচার করছেন যে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি দায়ী নয়, দায়ী পণ্যের অভাব। পণ্যই যদি নেই, তাহলে পণ্য-মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার মানেটা কী?

মানে অবশ্যই আছে আর সেটি হলো ভারত তথা হিন্দুস্থানের মাথার উপর মার্কিনী পুঁজিবাদী অর্থনীতির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। কিভাবে? মুদ্রাস্ফীতিকে অস্বীকার করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংককে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হচ্ছে না। মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাংকের একটি চিরাচরিত পদ্ধতি হলো ব্যাংকের ডিপোজিটের উপর সুদ বাড়িয়ে মানুষকে ব্যাংকে টাকা জমাতে প্রলুব্ধ করা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাংককে ব্যবহার করা হয় অল্প সুদে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়ার কাজে। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিতে ব্যাংককে ব্যবহার করা হয় মানুষের কল্যাণে, সামাজিক উন্নয়নে। বর্তমান ভারতের মার্কিন পুঁজিবাদের দালাল সরকার পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের অল্পসুদে ঋণ দেওয়ার স্বার্থে জমার উপর সুদ (সেভিংস রেট) বাড়াতে দিচ্ছে না। এর ভয়াবহ পরিণতি কী জানেন? এই চালু বিত্ত বছরের ২৩ এপ্রিলের মধ্যে ব্যাংকের ডিপোজিট কমে গেছে ২৩,৩২৮ কোটি টাকা আর আয়ের মূল ক্ষেত্র অর্থাৎ ঋণ দেওয়ার পরিমাণ কমে গেছে ২৬,৪৮৩ কোটি টাকা। এই পরিসংখ্যানটি রিজার্ভ ব্যাংকেরই দেওয়া। এসবই পুঁজিবাদী চক্রান্ত। 'প্রথমে রুগ্ন করে তুলে পরে পাগল বানিয়ে মারা'র ইংরেজ বণিকদের পদ্ধতি। ব্যাংকগুলিকে রুগ্ন করে তুলে এখানেও বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তরাত্মা— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দোসর ইতালিয়ান। গত ১ জুলাই থেকে ব্যাংকগুলির উপর থেকে ঋণের উপর সুদ নির্ধারণের রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ তুলে

> **"বর্তমান ভারতের মার্কিন পুঁজিবাদের দালাল সরকার পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের অল্পসুদে ঋণ দেওয়ার স্বার্থে জমার উপর সুদ (সেভিংস রেট) বাড়াতে দিচ্ছে না।"**

দেওয়া হয়েছে। এবার থেকে ব্যাংকগুলি তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণের উপর সুদের উচ্চতম হার ঘোষণা করবে, যার নাম দেওয়া হয়েছে Base Rate আগের BPLR (Banking Prime Lending Rate) পদ্ধতি তুলে দেওয়া হলো। Base Rate-এর কমে ঋণ দেওয়া চলবে না। ঋণদান হলো ব্যাংকের আয়ের উৎস। জমা প্রকল্প হলো ব্যয়ের উৎস। কারণ ঋণদান করে যা আয় হয় তার কিছুটা অংশ জমা আমানতের উপর সুদ দেওয়া হলো। সুতরাং ঋণের উপর সুদের হারের চেয়ে জমার উপর সুদের হার কম হতেই হবে। এদিকে সরকার প্রমোটারদের অল্প সুদে হোম লোন দিতে গিয়ে স্থায়ী জমা প্রকল্পের উপর সুদের হার বাড়তে দিচ্ছে না। ফলে ব্যাংকগুলির হাতে বিনিয়োগ-যোগ্য পুঁজির অভাব হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ব্যাংকগুলির ঋণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ হয়ে পড়ছে অসাধ্য। সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কিন ধাঁচে ছোট ছোট ব্যাংকগুলির পুঁজি নিয়ে এক একটি বৃহৎ বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank) গঠন করা।

এই হলো নিয়ন্ত্রণ মুক্ত তৈল শিল্প গঠনের মূল উদ্দেশ্য। আসল লক্ষ্য বাজার অর্থনীতির বিকাশ ঘটিয়ে কল্যাণকামী ভারতীয় রাষ্ট্রকে অনিয়ন্ত্রিত ভোগ দখলের রাষ্ট্রে পরিণত করা। এর আগে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলেও নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছিল। ওই সময়ে আটবার তেলের দাম বাড়ানো হয়েছিল কিন্তু সাতবার কমানোও হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার জন্য আজকের এই সমস্ত বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলি বাজপেয়ী সরকারকে সাহসী খেতাব দেয়নি। মনমোহন সিংহের সরকার ক্ষমতায় এসেই ২০০৪ সালে পুনরায় তেলের বিক্রয় মূল্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েও সেই থেকে তেলের মূল্য বৃদ্ধি রুখতে পারেনি, কমানো তো দূরের কথা। অতীতের একচেটিয়া কংগ্রেস রাজত্বের সময় ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তেলের মূল্যের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ৭০ থেকে ৭৩ সাল পর্যন্ত অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১.২০ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছিল ৩.৬৫ ডলার। ৭৩-৭৪ সালে এটা বেড়ে হয় ১০ ডলার। আর ১৯৮০ সালে বেড়ে হয় ৩০ ডলার। অর্থাৎ ৭০ থেকে ৮০'র এক দশকে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩০ গুণ। এই দশকটি কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ শুরুর দশক। আর সেই শুরু অন্তহীন তৈল মর্দনের রাজনৈতিক দলীয় সরকারি খেলার ইতিহাস। তেল আর বাজারের আর পাঁচটা জিনিসের মতো স্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধির নিয়মে চলে না। চলে সরকারি কলমের খোঁচায়।

যদি বলি মূল্য নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন ও গ্যাসের দাম বেপরোয়াভাবে বাড়বে। তার ফলে ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচকও বাড়বে, কিন্তু এতকালের কংগ্রেসী শাসনে তেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই তো জারি ছিল, তাহলে আজ সার্বিক মূল্য সূচক ১০ শতাংশের উপর চলে গেল কেন? আর ভোগ্যপণ্য মূল্যসূচক ১৪ শতাংশেরও উপর চলে গেল কি করে? কমিউনিস্ট পার্টিগুলো দাবী করে থাকে সরকারকে ভর্তুকি দিয়েই দাম কমিয়ে রাখতে হবে জনগণের কল্যাণে। কিন্তু হাতের কাছে প্রমাণ রয়েছে এই ভর্তুকি নির্ভর অর্থনীতি চালু রাখতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াটাই আজ ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে। সেখানে আজ চলছে ভয়াবহ জাতি দাঙ্গা। আবার যদি বলি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় আমেরিকাসহ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি মাত্র ২-৩ শতাংশ। কিন্তু গত বছর থেকে তো আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো একে একে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাচ্ছে। এ দেশগুলোর সরকারও দেখছি সরকারি সাহায্যের ভর্তুকির ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে অ-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ধারক-বাহক দেশগুলোর মতো।

তাহলে কোন্ পথটা ঠিক? বলা কঠিন, তবে দু'টি পথই বেঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন সন্ধান করতে হবে তৃতীয় পথের। সেই পথের দাবী এখনও দেশের ব্যাপক মানুষ তুলতে পারেনি যদিও তারা বৈদান্তিক স্বামী বিবেকানন্দের দেশের মানুষ। তবে এটুকু বলতে পারি তেলের দাম বাজারের আর পাঁচটা জিনিসের মতো স্বাভাবিক নিয়মে বাড়লে-কমলে সরকার যেমন তা নিয়ে ভোটের রাজনীতি করতে পারবে না, ঠিক তেমনিভাবে বিরোধী দলগুলোও এ নিয়ে বন্‌ধ্-এর রাজনীতি করতে পারবে না।

নিরাপদ আসনেও বড় ফাটল

(১ পাতার পর)

রাজ্য দফতর আলিমুদ্দিনের নেতাদের হিসাবে সিপিএম পঞ্চাশটি আসনে এবং বামফ্রন্টের শরিক দলেরা আঠারোটির মতো আসনে জিতবে।

সিপিএম নেতৃত্বের হিসাবে ভোট যথেষ্ট কমলেও রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ৬৮-৭০টি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা জয়ী হবেই। পার্টির দলীয় সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট যে কমরেডরা নির্বাচনের আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। সম্ভবত এই কারণেই মন্ত্রী গৌতম দেব থেকে রেজ্জাক মোল্লা কেউই আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী নন। দাবি উঠেছে প্রবীণদের সরিয়ে দিয়ে নবীনদের প্রার্থী করা হোক। প্রবীণ কমরেড-মন্ত্রীরাও তাল বুঝে কেটে পড়তে চাইছেন। গত ৩৫ বছরে যথেষ্ট কামাই হয়েছে। আরও বেশি লোভ করে কাজ নেই। অতি লোভে সম্পত্তি নষ্ট হয়। ইতিহাসের কী নিদারুণ পরিহাস। একদা এই লাল কমরেডরাই গুজব ছড়িয়ে ছিলেন যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেনরা বেনামে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন। বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত শহুরে সমাজকে সেই অসত্য অপপ্রচারকে বিশ্বাস করতেও দেখেছি। ডাঃ রায় তাঁর একমাত্র বসতবাড়িটি জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য দান করে দিয়ে যান। প্রফুল্ল সেন কপর্দক শূন্য হিসাবে জনৈক বন্ধুর আশ্রয়ে সকলের চোখের আড়ালে নীরবে বিদায় নেন। গুজব রটনাকারী সেইসব কমরেডরা অনেকেই পরে মন্ত্রী—বিধায়ক হয়েছেন। দাপটে রাজত্ব করেছেন। দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁদের সৃষ্ট কাদা মাখানোর ঘৃণ্য-রাজনীতি একদিন মৃত্যুবাণ হয়ে ফিরে আসবে। এখন পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় লোকের মুখে মুখে ফেরে কোন কমরেড নেতা এখন, কত টাকার মালিক। জনগণের টাকা মেরে কে কটা প্রাসাদ বানিয়েছে। সিরাজের আমলে জগৎ শেঠদের সম্পদ বেশি ছিল অথবা জ্যোতি-বুদ্ধর আমলে হলদিয়ার লক্ষ্মণ শেঠ এণ্ড কোং-দের। কমরেড নেতাদের বাড়ির গ্যারাজে কটা দামি গাড়ি আছে। কে কটা বিদেশী কুকুর পোষেন...ইত্যাদি। এইসব জল্পনা কল্পনা রটনা মানুষ বিশ্বাস করছে। কতটা রটনা, কতটা বাস্তব সেই বিচারে যাচ্ছে না। হয়তো সেদিনের রটনাবাজ কমরেডরা এখন বলবেন সেদিন আমাদের প্রচারে ভুল হয়েছিল। হ্যাঁ, এমন ভুল স্বীকার কমরেডরা নেতাজী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তাঁদের অতীত মূল্যায়নে করে থাকেন।

দ্বিতীয় দান্তেওয়াড়া

(১ পাতার পর)

মান্ধাতার আমলের অস্ত্র-শস্ত্র (যার মধ্যে প্রাচীন ৩০৩ রাইফেলও রয়েছে) নিয়ে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শেষপর্যন্ত সমালোচনা মুখে একটু হলেও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এনে দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতেও বিপত্তি। মাও-প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছেন না দেশের কূটনৈতিক থেকে রাজনৈতিক, কোনও মহল-ই। কেন্দ্রর থেকে সাহায্য চেয়েও পাওয়া যাচ্ছেনা। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল, এনিয়ে কেন্দ্রকে দায়ী করার পাশাপাশি ছোট মাঠে আর পান্ডববর্জিত জায়গায় ক্যাম্প করার জন্য বিহার সরকারেরও সমালোচনা করেছে। কিন্তু এই যাঁতাকলে পড়ে 'দ্বিতীয় দান্তেওয়াড়া' হবার আশঙ্কায় দিন-গুণছে বুদ্ধ গয়ার সি আই এ টি।

আশ্রয়ের সন্ধানে মাওবাদীরা

(১ পাতার পর)

সরকারি তরফে অভিযান চালানো হলে যাতে তার আঁচড় তাদের গায়ে না লাগে তার জন্য রেড করিডরের মধ্যে 'নিরাপদ স্বর্গ' গড়ে তুলতে। এমন কথাই পুলিশী জেরার মুখে স্বীকার করে নিয়েছে ধৃত মাওবাদী বান্দু মেশ্রাম।

সর্বাগ্রে চাই স্বার্থত্যাগ শ্রীভাগবত

(১ পাতার পর)

হতে পারেন?

এদিন সভার দ্বিতীয় বক্তা বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন গডকরি প্রথমেই তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্য বিষয়ে আরও একবার কঠোর অবস্থানের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই সংসদ আক্রমণকারীর ফাঁসীর আদেশ কার্যকর করতে যাতে সুপারিশ না করা হয় সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংসদ আক্রমণে নিহতদের পরিবারের সদস্যরা মরণোত্তর পদক ফেরৎ দিতে চেয়েছেন। তাঁদের কাছেই সরকারের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। তাঁর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই। আবারও তিনি প্রশ্ন করেন— সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পালন না করে ছ'বছর ধরে আফজল গুরুকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?

যুব সমাজের উদ্দেশ্যে নীতিনজীর বক্তব্য— প্রথমে রাষ্ট্র, তারপর দল এবং সবশেষে ব্যক্তি। এজন্যই শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষাজগৎ থেকে রাজনীতিতে এসেছিলেন। স্বল্পকাল উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিয়েছেন।

১৯৪৭ থেকেই নেহেরুর ভুলনীতির জন্য আজ কাশ্মীরের এই অবস্থা। দেশের প্রায় অর্দ্ধেক মানুষের দৈনন্দিন ক্রয়ক্ষমতা মাত্র কুড়ি টাকা। এসবই দেশের ভুল আর্থিক নীতি এবং অপশাসন-এর কুফল। আমাদের সবকিছু থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রথম সারিতে নেই কেন? জাপানের এক মন্ত্রীর কথার উল্লেখ করে গডকরি বলেন, আমরা সমৃদ্ধ জাতি (Nation) হলেও গরীব জনগণের দেশ (রিচ নেশন উইথ পুওর পপুলেশন)। এখন এখন সারা পৃথিবীতেই মাওবাদ, মার্কসবাদের কোনও প্রাসঙ্গিকতাই নেই। দেশের ২৩০টি জেলায় মাওবাদীদের রমরমা। দেশের পাঁচটি রাজ্যে চীনা অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার নিশ্চুপ, নীরব। আমেরিকার চাপে পাকিস্তান-নীতি ঠিক হয়। দেশের উত্থানের জন্য শ্যামাপ্রসাদ ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পথে চলতে হবে। দীনদয়ালজী 'অন্ত্যোদয়'— সবচেয়ে পিছনের ব্যক্তিটির উন্নতির কথা বলেছেন। এজন্য 'ভিশন্' এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি চাই।

একবিংশ শতাব্দীকে শ্রীগডকরি ভারতের বলে অভিমত প্রকাশ করেন। কেননা একবিংশ শতাব্দীর মূল উপাদানই হলো— ইনফরমেশন টেকনোলজি এবং বায়ো-টেকনোলজি। যার অধিকারী ভারতবর্ষ। আমেরিকায় প্রতি দশজন ডাক্তারের ছয়জনই ভারতীয়। একই অবস্থা আই টি প্রফেশন্যালদের ক্ষেত্রেও। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রীগডকরির সোজা কথা— এ ক্রিমিন্যাল ইজ এ ক্রিমিন্যাল, এ টেররিস্ট ইজ এ টেররিস্ট। তাদের কোনও ধর্ম নেই।

এদিন শ্যামাপ্রসাদের রচনার এক সংকলন প্রকাশ করা হয় শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। সমৃদ্ধ বইটির উন্মোচন করেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সেইসঙ্গে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যার (৫ জুলাই, '১০ সংস্করণ) উন্মোচন করেন বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি। উন্মোচনের জন্য তাঁর হাতে বিশেষ সংখ্যাটি তুলে দেন স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশনের পক্ষে বিশিষ্ট বিজেপি নেতা ডাঃ হর্ষবর্ধন। তিনি জনসংঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বিকেল চারটায় ৭৭, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোডে আশুতোষ স্মারক ভবনে শ্যামাপ্রসাদ-এর জীবনের বিভিন্ন ছবির এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এবং নীতিন গডকরি। তাঁরা শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মালা দেন। শ্যামাপ্রসাদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী এবং অন্যরা মোহনজী এবং নীতিনজীকে স্বাগত জানান। মহাজাতি সদনের মঞ্চে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা, বিজেপি নেতা অরুণ সিং, রামনাথ কোবিদ, আর এস এস-এর পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির সাহা, সভাপতি মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলী, সাংসদ এবং শ্যামাপ্রসাদ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয়। সভা পরিচালনা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সভাপতি ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন। ধন্যবাদ জানান রামনাথ কোবিদ। হলে তো তিল ধারণের জায়গা ছিল না, এছাড়া বাইরে ক্লোজ সার্কিট টিভির ব্যবস্থা ছিল বলে হাজার হাজার মানুষ সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। পুনা থেকে ভিডিও রেকর্ড করে আনা শ্যামাপ্রসাদ কন্যা সবিতাদেবীর বক্তব্য পর্দায় সকলকে দেখানো হয়। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে দেশের কাজের জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

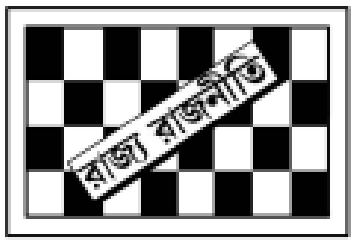

রাজ্য রাজনীতি

ক্ষয়রোগগ্রস্ত সি পি এমের ক্ষয় অব্যাহত

নিশাকর সোম

অনেক কষ্টে দুর্গাপুরের বিধানসভার নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থী মাত্র আট হাজার ভোটে জিতলেন। আগে প্রয়াত মন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জি ৪০ হাজার ভোটের মার্জিনে জিতেছিলেন। এবারের ফলাফল প্রমাণ করে দিল সিপিএম কতটা ক্ষয়রোগগ্রস্ত। এখন হয়ত সিপিএম নেতৃত্ব এই জয়ে আত্মপ্রসাদ ও আত্মশ্লাঘাতে আচ্ছন্ন হবেন। এর ফলে তাদের ক্ষয়ও বাড়বে। জনগণ এখনও তাঁদের বিরুদ্ধেই আছেন। তাঁদেরকে আরও বিরুদ্ধ করে তুলছে সিপিএম নেতাদের সাম্প্রতিক কিছু অবমাননাকর মন্তব্য। বিমান বসুর মন্তব্য— টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়েছে, বিনয় কোঙারের বক্তব্য— জনগণ দু'বার বিষপান করেছে। এই নেতারা কি সিপিএম-এর মৃত্যুর নিদান ঘোষণা করলেন?

বর্ধমানের উপনির্বাচনটি ৫ তারিখের ভারত বন্ধের দিন হয়েছিল। ওইদিন কার্যত বামফ্রন্ট এবং বিজেপি সমান্তরালভাবে বন্ধের ডাক দিয়ে আবার এক নতুন পরিস্থিতি গড়ে তুললো। উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিজেপি-র কাছে সিপিআই এবং সিপিএম-এর প্রতিনিধি দল গেছলেন। গুরুদাস দাশগুপ্ত তথা সিপিআই-এর বক্তব্য, ''আমরা বিজেপি-এর সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্য করছি না, আমজনতার দাবিতে এক হয়ে আন্দোলন করছি''। সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের বক্তব্য, বিজেপি যখন বিরোধী দলে তখন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ার জন্য বিজেপি-র সমান্তরালভাবে আন্দোলনে কোনও ভুল হবে না। প্রসঙ্গত সিপিএম-এর পলিটব্যুরোতে এই বঙ্গের পি বি সদস্যগণ কংগ্রেসের আঁচলের তলায় থাকার জন্য বিজেপি-কে প্রধান শত্রু বলতে চায়। তাঁরা এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে তোয়াজ করে নিজেদের বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

কিন্তু পলিটব্যুরোতে কংগ্রেস-বিরোধী বক্তব্যই গৃহীত হয়েছে রণনীতি হিসাবে। কি কৌশল হবে তা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচিত হবে। এ-কথা এখন থেকেই বলা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে আই এন টি ইউ সি, ভারতীয় মজদুর সংঘ-কে নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নীতিই গৃহীত হয়। প্রকাশ কারাতকে যতই ''কেতাবী'' বলে উপহাস করা হোক, কারাত-এর লাইনই গৃহীত হবে, হয়তো কিছু বাক্যের অদল-বদল করে।

প্রকাশ কারাত-পান্ধের জোট চাইছেন কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরানো কায়দায় সংগ্রামী করে তুলতে। কিন্তু তা' হবার নয়। প্রসঙ্গত, প্রয়াত জ্যোতি বসু-কে নিয়ে বিধানসভায় অনেক আদিখ্যেতা হলো। আর এক বিলিতিবাবু বক্তৃতা করলেন। যিনি পার্টি সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ করেছিলেন। সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৪৯-১৯৫১ পর্যন্ত তেলেঙ্গানায় যে-সংগ্রাম কমিউনিস্টরা করেছিলেন, তা ১৯৫২-এর প্রথম নির্বাচনের মুখে প্রত্যাহার করা এবং তেলেঙ্গানার কৃষক-আন্দোলনকারীদের অস্ত্র সংবরণ করে তা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট জমা দেবার যে পরামর্শ জওহরলাল নেহরু দাবি করেছিলেন— তা মেনে নেন— সরকারের সঙ্গে আলোচনাকারী জ্যোতি বসু ও মুজফ্‌ফর আহমেদ। এতে বিলেতের কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তের পরামর্শ ছিল। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অন্যতম নেতা (অন্ধ্র) নাগি রেড্ডি একবার বলেছিলেন, বিলিতি কমরেডরা কৃষকদের কথা কোনওদিনই ভাবেননি। তাঁরা নির্বাচন করে সরকারে থাকার দিকেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই চলেছিলেন। জ্যোতি বসু এ-ব্যাপারে মুখিয়া ছিলেন। ১৯৬৯-তে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের পর জ্যোতি বসু রাজ্য-দপ্তরে বসে কলকাতার কয়েকজন নেতাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, ''আপনাদের মতোন কিছু অর্বাচীন নেতার জন্য এই সরকার পড়ে গেল। এ-দেশে কখনও বিপ্লব হবে না। এ-কথাই জ্যোতি বসু পুনরুক্তি করেছিলেন প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের পর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক-এর প্রশ্নের জবাবে। তিনি বলেছিলেন, একের পর এক রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার দখল করতে হবে। সেই কারণেই সালকিয়া প্লেনামে সুন্দরাইয়া-এর কৃষিবিপ্লবের দলিল এবং নীতি বর্জিত হয়। তেলেঙ্গানার আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুন্দরাইয়া পার্টি ছেড়ে দেন! জ্যোতি বসুর আর এক কীর্তি নৃপেন চক্রবর্তীকে বহিষ্কার করা। কারণ তিনি জ্যোতি বসুর সমালোচনা করেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ত্রিপুরার সিপিএম-এর যে আচরণ-নীতির বিরোধিতা নৃপেন চক্রবর্তী করেছিলেন, তাঁরই ভাবশিষ্য মানিক সরকার তা চালাচ্ছেন। আজ মানিক সরকারই কারাতের উদাহরণ। বুদ্ধদেব আজ তাঁর চোখের বালি। একজন বন্দিত, অপরজন নিন্দিত। বিনয় চৌধুরীকেও চলে যেতে হয় জ্যোতি বসুর কোপে। জ্যোতি বসু কতবার পার্টিকে এড়িয়ে নিজের মতোন চলেছিলেন, তার বিশদ-এ যাচ্ছি না। মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি— বিধান সভায় বিরোধী নেতাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত হয়। জ্যোতি বসুও বিরোধী নেতা হিসাবে সেই সুযোগ নেবার সিদ্ধান্ত নেন। এর বিরুদ্ধে তদানীন্তন রাজ্য-কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এবং ভবানী সেনগুপ্ত বিরোধিতা করে পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের নিকট দরবার করেন। অজয় ঘোষ তথা তখনকার পলিটব্যুরো জ্যোতি বাবুকে এই সুযোগ না-নেবার সিদ্ধান্ত জানায়। এ-ব্যাপারে অজয় ঘোষের বক্তব্য পার্টি-চিঠি আকারে বেরোয়।

১৯৬৪ সালে জ্যোতি বসুকে জেল থেকে প্রথম মুক্তি দেওয়া হয়। গোপন পার্টি কেন্দ্রের সম্পাদক গণেশ ঘোষ তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য জ্যোতিবাবুকে চিঠি দেন। জ্যোতিবাবু তা অগ্রাহ্য করে মুক্তি পেয়েই দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে চলে যান, পার্টির গোপন কেন্দ্রকে কলা দেখিয়ে।

আবার ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষকনেতা আবদুল্লা রসুলকে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত করেছিল সিপিএম-রাজ্য কমিটি। জ্যোতি বসু সেই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে তাঁর গোষ্ঠীর নেতা নিরঞ্জন সেন-কে পুনর্বাসন মন্ত্রী করেন। জ্যোতিবাবুর যুক্তি ছিল একজন মুসলমানকে বাস্তুহারা পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে জনসাধারণ মেনে নেবেন না। এরপর তো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সব কিস্‌সাতো সবাই জানেন। জ্যোতি বসুর আস্কারাতেই সুভাষ চক্রবর্তী সমান্তরালভাবে পার্টি তৈরি করেছিলেন। তাই আজ সমগ্র পার্টিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে। আর কোনও উপায় নেই। এছাড়া জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের জন্য কোনও পরিকল্পনা করে যাননি। দিনগত পাপক্ষয় করেছিলেন। এ হেন জ্যোতি বসু সম্বন্ধে বলা যায় পার্টিতে বৈভব অ্যারিস্টোক্রেসি প্রতিষ্ঠা করে পার্টির গরীবমুখী নীতিকে সফলভাবে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

জ্যোতি বসুর কায়দায় চলতে গিয়ে বিমান বসু জনগণকে অপমান করে বলেন, ''টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়েছে।'' বিনয় কোঙার বলেন ''জনগণ বিষ খেয়েছে''! এঁরা জনগণকে অপমান করেছেন। এঁদের জনগণ কখনও ক্ষমা করবে না। বুদ্ধ-নিরুপম-এর নীতির ফলে বামফ্রন্টের সর্বনাশ হয়েছে। এঁরা পার্টিকে না জানিয়ে, শরিকদের অগ্রাহ্য করে

(এরপর ১৪ পাতায়)

ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বলেন— শিল্পায়নের নামে রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে আনা হয়েছে। বুদ্ধ বাবুর জেলা সফর ব্যর্থ বুদ্ধ বাবুর গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এস পি-ও সরাসরি বলেছে— ''মহারাষ্ট্র গুজরাটের মতো শিল্পায়ন হবে না। পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প তথা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা উচিত ছিল। সিপিএম-এর জন্যই বামফ্রন্ট ধ্বংস হয়ে গেল।'' কিরণময় নন্দ বলেছেন— ''সরকারের মৃত্যু হয়েছে—ডেথ সার্টিফিকেট জনগণ হাতে গুঁজে দিয়েছে।''

অফ রকম

মাতৃভূমির সন্ধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষের নোবেল প্রাপকদের তালিকায় স্যার বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নইপালের নাম যে কস্মিনকালেও শোনা যায়নি— একথা হলফ করেই বলা যায়। ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কার জেতেন বিদ্যাধর। কয়েকপুরুষ যাবৎ প্রবাসী। কিন্তু মাতৃভূমির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা একেবারেই ছিন্ন হয়ে যায়নি। নইপলের জন্ম ত্রিনিদাদে। ১৯৫০ সাল থেকে বৃটেনের উইল্টশায়ারের পাকাপাকি অধিবাসী।

পাকিস্তানী সাংবাদিক নাদিরাকে বিয়ে করেন। উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে ঠাকুর্দার বাড়ি ছিল নইপলের। নইপল ইতিপূর্বে তাঁর বহু লেখায় নিজের 'ভারতীয় অরিজিন' সম্বন্ধে বহু কিছু লিখেছেন। সেই দিক দিয়ে সারা বিশ্ব তো বটেই, সেইসঙ্গে ভারতেও পরিচিত মুখ তিনি। কিন্তু গুণীর কদর বোঝে ক'জন?

বেশি ক'জন যে বোঝে না তার প্রমাণ হাড়ে হাড়ে পেয়েছেন নইপলের পরিবার।

সস্ত্রীক বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নইপল।

সম্প্রতি তিনি পারসন অব্‌ ইন্ডিয়ান অরিজিন কার্ড (পি আই ও)-র জন্য দরখাস্ত করেছিলেন বিলেতের ভারতীয় দূতাবাসে। তুর্কি থেকে তাঁর স্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন—''তিনমাস আগে আমাদের পারিবারিক বন্ধু লেখক ফারুক ধোন্দিকে নিয়ে হাই-কমিশন (বিলেতের) অফিসে যাই। গোরখপুর গ্রামে আমার স্বামীর পারিবারিক উত্তরাধিকার সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণাদি তাঁদের দিই। কিন্তু দেখলাম যে তাঁরা কিছুই জানেন না।'' ফারুকও বলছেন— ''যে সেকেন্ড অফিসারের সঙ্গে আমরা দেখা করেছিলাম, যদিও তাঁর নামটা আমার স্মরণে নেই, তিনি তথ্য-প্রমাণাদি গুলো সব দেখেও বললেন, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে যেখানে নইপলের পূর্বপুরুষরা থাকতেন সেখানকার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে এফিডেভিট করিয়ে এখানে জমা দিতে হবে।'' প্রশ্ন উঠছে, বিদ্যাধর নইপলের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, যাঁর ভারত চর্চা সুবিদিত তিনি তাঁর 'অরিজিনে'র (উৎস) স্বীকৃতি চাইলে ভারতীয় দূতাবাসের তাঁকে 'হ্যারাস' করার ক্ষমতা আদৌ আছে কি? নইপলের এদেশীয় 'অরিজিন'কে স্বীকৃতিদান কেবল কূটনৈতিক আঙিনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না তার উত্তরণ ঘটবে সংস্কৃতির আঙিনায়, উঠছে সে প্রশ্নও। তাঁকে 'হ্যারাস' করার অর্থই হচ্ছে— আর পাঁচটা ভারতীয়র মতোই তাঁর পরবর্তী 'জেনারেশন'কেও ভুলিয়ে দেওয়া হবে যে সে ভারতীয়। প্রসঙ্গত, পি আই ও কার্ড 'হোল্ডার'দের 'ভারতীয় ভিসা'র জন্য আবেদন করার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁরা যে কোনও সময়, যখন খুশী ভারতবর্ষের যে কোনও প্রান্তে 'ভিসা' ছাড়াই যেতে পারবেন। নইপল বিখ্যাত লোক, এনিয়ে হইচই হলে তাঁর পি আই ও কার্ড প্রাপ্তির পথ নিশ্চয়ই সুগম হবে।

কিন্তু কোনও অখ্যাত প্রবাসীর বেলাও যে একই ঘটনা ঘটবে বা ঘটছে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? মাতৃভূমি সন্ধান, পূর্বপুরুষদের শেকড়ের অনুসন্ধান করতে চাওয়া কি অপরাধ?

অসমে রাজনীতি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস সমানতালে চলছে

সংবাদদাতা ॥ জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এন আই এ) কাঠমাণ্ডু থেকে গ্রেপ্তার করল নিরঞ্জনকে। অসমের উত্তর কাছাড় জেলার সদর শহর হাফলং-এর বন্দীশিবির থেকে আত্মসমর্পণ-এর কয়েকদিনের মধ্যেই

তরুণ গগৈ এবং নিরঞ্জন হোজাই।

সাতজন সঙ্গীসহ পালিয়ে গিয়েছিল নিরঞ্জন হোজাই। প্রসঙ্গত, ছোটখাটো চেহারার নিরঞ্জনই দুর্ধর্ষ জঙ্গি সংগঠন ব্ল্যাক উইডো (ডি এইচ ডি)-র কমাণ্ডার ইন চীফ্। সন্ত্রাসী সংগঠনটির সর্বময় প্রধান জুয়েল গার্লোসা গত বছর ৫ জুন দক্ষিণ ভারতে ধরা পড়ার পর শেষমেশ প্রায় চারশতাধিক জঙ্গি (৪১৬ জন) অস্ত্রসহ ২রা অক্টোবর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ করে। নিরঞ্জনকে জড়িয়ে ফটো তুলতে পোজ দিয়েছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। পঞ্চাশ কোটি টাকার উন্নয়ন প্যাকেজ দিয়ে একটা রফা হয়েছিল।

তবে সেটা যে সাময়িক এবং ভঙ্গুর তা কয়েকদিন বাদেই টের পাওয়া গিয়েছিল যখন ডেজিগনেশন ক্যাম্প থেকে আত্মসমর্পণকারীরা পালাতে থাকে। এখন একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসছে— তবে কি জঙ্গিদের পালানোর পিছনে অন্য কোনও অঙ্ক কাজ করেছিল? গত ২ জুলাই রাত্রিতে সিঙ্গাপুর থেকে কাঠমাণ্ডু বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পরই এন আই এ-র গোয়েন্দারা নিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে দিল্লীতে নিয়ে আসেন। দিল্লীতেই ট্রানজিট রিমাণ্ডে রেখে জেরা চলছে নিরঞ্জন-এর। তবে সরকারিভাবে নিরঞ্জনের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে দিল্লী ও দিসপুর মুখে রা কাড়ছে না। এদিকে সরকার কিছু না বললেও ব্ল্যাক উইডোর ডেপুটি কমাণ্ডার ইন্ চীফ্ ড্যানিয়েল গার্লোসা নিরঞ্জনের গ্রেপ্তারের খবর সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন। গ্রেপ্তারের খবর ডিমা হাসাও (উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা) জেলায় পৌঁছানোর পরই ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অসম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এতদিন নিরঞ্জন হোজাইকে পলাতক হিসেবে দেখানো হোত।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার উন্নয়নের টাকা নিরঞ্জনের মাধ্যমে ব্ল্যাক উইডোর ডেরায় পৌঁছে যেত। জেলার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে সে যুক্ত বলে এন আই এ-এর চার্জশীটে তার নাম আছে। আত্মসমর্পণের আগে নিরঞ্জন চীনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ফোনে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পাকা কথা হওয়ার পর তার আত্মসমর্পণ-এর নাটক চূড়ান্ত হয়েছিল।

নিরঞ্জন বেপাত্তা হওয়ার পর রাজ্য সরকার-এর বক্তব্য ছিল— নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্বাভাবিক প্রশ্ন—নিরঞ্জন হোজাই কি মাটির তলা দিয়ে সিঙ্গাপুর ও কাঠমাণ্ডুতে পালিয়েছিল? এরকম ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীকে নিয়ে চোর-পুলিশ খেলার পিছনের খেলাটা কে খেলছে? এবার তার গ্রেপ্তারে হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি নিয়ে সি বি আই এবং এন আই এ-এর তদন্ত নতুন মোড় নেবে বলে ধরা যেতে পারে।

২০০১ সালে উত্তর কাছাড় জেলার স্বশাসিত পরিষদে কংগ্রেস-এর ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ডিমা হাসাও (উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা) জেলায় দুর্নীতি লাগামছাড়া হয়ে যায়। উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের টাকা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও জঙ্গিদের পকেটে ঢুকে পড়তে থাকে। এসম্বন্ধে তথ্য ও নথিপত্র সি বি আই-এর হাতে পৌঁছে গেছে বলে জানা গেছে।

এই শাসক দলের মতদপুষ্ট আর্থিক কেলেংকারির নায়ক রেদাউল হোসেন খাঁন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মাহুরে সমাজকল্যাণ বিভাগের সি ডি পি ও-হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পরই কয়েকজন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়ে লাগামহীন বেপরোয়া আর্থিক লুটের সঙ্গে বা অন্য ভাষায় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। উত্তর কাছাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদের ৩০টি সরকারি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ২০০১ থেকে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকার বিরোধীদের প্রবল চাপে ২০০৭-২০০৯ পর্যন্ত পাঁচটি বিভাগের দুর্নীতির তদন্তভার তুলে দিয়েছে সি বি আই-এর হাতে। আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত এই অভিযোগে প্রাক্তন রাজ্যপাল অজয় সিংহ, প্রাক্তন জেলাশাসক অনিল কুমার বরুয়া, গ্রামোন্নয়ন বিভাগের প্রাক্তন সঞ্চ লক এইচ পি রাজকুমার, সাংসদ দীপ গগৈ, প্রাক্তন দোর্দণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক গোবিন্দ লাংথাসা, রাজ্যপালের প্রাক্তন এ ডি সি-এস জগন্নাথন, জেলার মুখ্য বনপাল ডি জামান, পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার এম সারণ, পূর্ত দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য অভিযন্তা (ট্রস্তস্তনন্ধনপ্স্ত্রপ্ত ট্রড়নন্দ্বন্দ্র ড্রন্ধন্‌ন্দ্বন্দ্বজ) কমলাপ্রসাদ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার করুণা সাইকিয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত করানোর দাবী তুলেছেন ডিমা হাসাও জেলার অটোনমাস স্টেট ডিমাণ্ড কমিটির সভাপতি রথীন্দ্র থাওসেন। তিনি ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তদন্ত করানোর সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবী ২০০১ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত আর্থিক দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে।

ইতিমধ্যে রেদাউল গ্রেপ্তার হয়েছে। তার ভগ্নিপতি আমজাদ হুসেনের বাড়ি থেকে সি বি আই ১৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা নগদ এবং অনেক নথিপত্র উদ্ধার করেছে। আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হলে নির্বাচনের মুখে অসুবিধায় পড়বে কংগ্রেস। এজন্য নিরঞ্জন হোজাই মুখ খুললে কংগ্রেসের জন্য তা ভালো হবে না। এদিকে ডিমা হাসাও জেলায় নিরঞ্জন হোজাই-এর মুক্তির দাবীতে ইতিমধ্যে চারদিন বন্ধ পালিত হয়েছে। পরে ব্যাপক আন্দোলনের হুমকি এসেছে ডিমাসা জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে। বিজেপি'র কর্মীরা গুয়াহাটিতে রেদাউল হুসেন খাঁনের আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রীদের যুক্ত থাকার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেছেন। গত বছরই উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মুখ্য কার্যনির্বাহীর এক প্রতিনিধি মেঘালয়ে নগদ এককোটি টাকা উগ্রপন্থীদের দেওয়ার সময়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সেই মামলাও চালু রয়েছে। আর্থিক দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-এর কুশপুতুল পোড়াচ্ছেন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা।

বাংলাদেশে জেহাদ শুরু হতে চলেছে

বাংলাদেশের আয়নায়

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ তালেবান প্রধান মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বাংলাদেশে জেহাদ শুরুর অনুমতি দিয়েছেন। আর এই অনুমতি পাওয়ার পরপরই দেশজুড়ে সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠাই হবে এই জিহাদের লক্ষ্য। হরকাতুল জেহাদ আল ইসলামির (হুজি) তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আলাপ আলোচনার জন্যে বর্তমানে আফগানিস্তানে রয়েছে। জেহাদ শুরু হওয়ার ঠিক আগেই তারা বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে জানা গেছে, বাংলাদেশে জেহাদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হরকাতুল জিহাদ এক হাজার মুফতির সই নিয়ে একটি ফতোয়াও জারি করবে। সঙ্গে মোল্লা ওমরের অনুমতির বিষয়টিও প্রচার করবে। অত্যন্ত গোপনে এই সই সংগ্রহের কাজ চলছে। সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামির তিন শীর্ষ নেতা দলের আমির মতিউর রহমান নিজামি, মহাসচিব আলি আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও নায়েবে আমির দেলোয়ার হোসেন সাঈদি গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেহাদ শুরুর সময় আরও এগিয়ে আনার চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে হুজির বিভিন্ন স্তরে।

জানা গেছে, বাংলাদেশে হরকাতুল জেহাদ আল ইসলামি (হুজি) জেহাদ শুরুর প্রশ্নে তিন উপদলে ইতিপূর্বে বিভক্ত হয়ে গেলেও এখন নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে এক হয়ে গেছে। তিন উপদল আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়ে কাজ করছিল। মুফতি আবদুল হান্নান হরকাতুল মুজাহিদিন, মুফতি আবদুর রউফ তামির উদ-দীন এবং মুফতি আবদুস সালাম হরকাতুল জিহাদের নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে মুফতি সালাম হরকাতুল জিহাদ নাম পরিবর্তন করে প্রকাশ্য রাজনীতিতে

মোল্লা ওমর

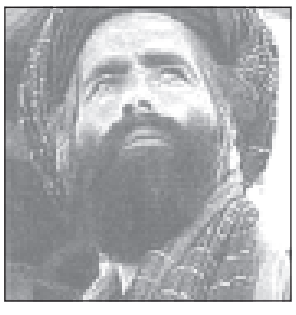

আসার চেষ্টা করেছিলেন। মূলত আফগানিস্তান ফেরত মুজাহিদদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল হুজি। একটি সূত্র বলছে, মোল্লা ওমর জেহাদের ব্যাপারে মতৈক্য প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সিদ্ধান্ত হয়েছে, চলতি মাসেই তারা এক হয়ে কাজ শুরু করবে এবং আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মধ্যেই বড় কোনও ঘটনা ঘটিয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেবে। এর পরেই জেহাদ শুরুর প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে।

যতদূর আভাস পাওয়া যাচ্ছে, হুজি নেতারা কারাগারে থাকলেও ঐক্য প্রক্রিয়া কিংবা জেহাদের প্রস্তুতি থেমে থাকেনি। হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামির মজলিসে আমেলার (নির্বাহী কমিটি) এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাংবাদিকদের বলেছেন, আমাদের সশস্ত্র জেহাদের অভিজ্ঞতা আছে। আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম জীবিত ফিরে আসার জন্যে নয়। এখন বেঁচে থাকাটাই আমাদের বোনাস। জেহাদ আমাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষের বিন্দুমাত্র ক্ষতি আমরা চাই না। এর পরও জেহাদ শুরু হলে কিছু ক্ষতি তো হবেই। আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চাই। সাফল্য দেবেন আল্লাহ। ন'মাস যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে প্রয়োজন হলে আমরা ন'বছর জেহাদ চালিয়ে যাবো। আফগানিস্তানে তালেবানরা এখনও জেহাদ করছে। আমাদের ধমনীতে সেই তালেবানি রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বঞ্চ নার বিরুদ্ধে সরব হিমাচল, উত্তরাখণ্ডের সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশে আবগারী শিল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ছাড় বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় মুখোমুখি হলো তীব্র সমালোচনার। বিজেপি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরাসরি এন ডি এ

রমেশ পোখরিয়াল

প্রেমকুমার ধূমল

পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ এনেছে। বিজেপি মনে করছে, কংগ্রেস এর মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। গত ৩ জুলাই বিজেপি-র একটি উচ্চস্তরীয় প্রতিনিধি দল এল কে আদবানীর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করেন। ওই প্রতিনিধি দলে আদবানী ছাড়াও ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা স্বরাজ, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা অরুণ জেটলি, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমকুমার ধূমল, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। ২০০০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পার্বত্য জেলাগুলিতে যে 'বিশেষ শিল্প প্যাকেজ' ঘোষিত হয়েছিল বর্তমান সরকারের আমলে তা ব্যাহত হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা অবহিত করেন।

এ প্রসঙ্গে সুষমা স্বরাজের বক্তব্য— "আমরা প্রধানমন্ত্রীকে নতুন কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি বাজপেয়ী সরকারের আমলে যে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল আপনারা সেটাই খালি বজায় রাখুন, তাহলেই হবে! হিমাচল আর উত্তরাখণ্ডের মতো দু'টি পাহাড়ী রাজ্যে একাধিক নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। উন্নয়নের জন্য তাই কেন্দ্রের সাহায্য সেখানে একান্তই প্রয়োজন।"

কেন্দ্র যে বিজেপি-র প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চ না করছে তার প্রমাণ উত্তর-পূর্ব ভারতে ১৯৮৭ সালে ওই একই শিল্প প্যাকেজ ঘোষিত হয়েছিল এবং ২০০৭ সালে সেই প্যাকেজ আগামী আরও দশ বছরের জন্য বর্ধিত হয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রেও। তারাও সেই একই প্যাকেজের লাভ এখনও ঘরে তুলছে।

দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রী প্রেম কুমার ধূমল এবং রমেশ পোখরিয়াল জানিয়েছেন যদি কেন্দ্রিয় সরকার তাদের দাবি পূরণ না করে তবে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। বিজেপি-র পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে— "বিশেষ উৎসাহদায়ক প্যাকেজ' ('স্পেশাল ইনসেনটিভ প্যাকেজ')-এ আবগারি শুল্ক-কে যে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল পার্বত্য রাজ্যগুলোতে তা যদি হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তবে রাজ্যদু'টির ওপর চরম অবিচার করা হবে।'

বিজেপি-র বক্তব্য, কেন্দ্র সরকার শুধু পাহাড়ী রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নেই ব্যর্থ হয়নি, সেখানে সঠিক শিল্প-নীতি প্রণয়নেও করতে পারেনি।

ধ্বংস হতে বসেছে নীলগিরি চা-শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঘন কালো, সুগন্ধী, চমৎকার ফ্লেভারের নীলগিরি চায়ের দিন বোধহয় শেষ। বিখ্যাত ভারতীয় চা'য়ের মধ্যে নীলগিরি চায়ের নাম সেভাবে হয়তো আসে না। কিন্তু গত এক দশকে নিজ ফ্লেভারের গুণে নীলগিরি চা বেশ সুনাম অর্জন করেছে।

নীলগিরি চা বাগান

কিন্তু এবছর বাজারজাত হবার পর থেকেই তার বাজার মন্দা যেতে শুরু করেছে। অনুসন্ধান করে জানা গেল— যে 'ফ্লেভারে'র জন্য নীলগিরি চায়ের এত নাম-ডাক, সেই ফ্লে ভার প্রায় অস্তমিত। এর কারণ রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং বাতিল হয়ে যাওয়া যান্ত্রিক পদ্ধতির এখনও ব্যবহার যা প্রতিযোগিতার বাজারে নীলগিরি চা-কে বেশ পেছনে ফেলে দিয়েছে। নীলগিরি চা আদতে কেরলের। সেখানকার শাসক সিপিএমের বদান্যতায় চা-শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক পাওয়াই এখন দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট কৃষকেরা বুঝেছেন চা চাষ করার তুলনায় অন্য কোনও ফসল চাষ করলে সেটা বেশি লাভদায়ক হবে। কারণ চা চাষ করার পরে তা তোলার জন্য যে নারী-শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, সময় মতো তা মিলছে না ইদানীং কালে। দ্বিতীয়ত, চা বাজারজাত করার পূর্বে প্যাকিংসহ একাধিক বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে চাষীদের নিজেদেরকেই। প্রতিপদে পার্টিকে তুষ্ট করার একটা ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। এরপর কারিগরি অযোগ্যতার জন্য গুণমান যেই কমতে শুরু করেছে, সঙ্গে সঙ্গে নীলগিরি চায়ের বাজারও পড়তে শুরু করেছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ মাত্র ৬ টাকা দরে চা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন চাষীরা। কারণ এর বেশি আর দাম পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকারের কাছে এনিয়ে বহুবার দ্বারস্থ হয়েছেন ফ্যাক্টরি মালিকরা। কিন্তু এনিয়ে কোনও উচ্চ-বাচ্য করছে না রাজ্য সরকার। এমনকী ভারতীয় চা সংস্থার কন্নুর জোনাল এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আর আমবালাভানাম কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন একটা সমাধান বার করতে। বলা বাহুল্য, রাজ্যপার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে আমবালাভানামের আলোচনাও একটা গোপন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মাঝখান থেকে নীলগিরি চা শিল্পের কপালে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংসহ উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের ললাট- লিপিই জুটতে চলেছে।

নীলগিরি চা শিল্প প্রাকৃতিক সুবিধা যেটা পেয়েছিল, রাজনৈতিক ধান্দাবাজির কারণে সেই সুবিধা কাজে লাগানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেই কারণে একটা উন্নয়নশীল শিল্প আজ মাঠে মারা যেতে বসেছে।

বর্তমানে এদেশে চা'য়ের বাজার বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শ্রীলঙ্কা এবং কেনিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ চা আমদানী হচ্ছে এদেশে। সুতরাং বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে, আধুনিক হতেই হবে। সেটা যেমন চা শিল্পের 'অর্থনৈতিক কৌশলে'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি 'কারিগরি দিকে'র ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। নীলগিরি চায়ের দাম-ই কেবল বেড়ে এসেছে গত কয়েকবছর। গুণমান সেভাবে বাড়েনি।

ছত্তিশগড় মডেল-ই অনুসরণ করছে সোনিয়ার জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ (ন্যাশানাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল) খাদ্য-ভর্তুকির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংস্কারের চেনা ছক থেকে বেড়িয়ে কিছুটা

সোনিয়া

রক্ষণশীল পথে হাঁটতে চাইছে। মুখে বলছে, খাদ্য ভর্তুকির বিশ্বায়ন খাতায়-কলমে সম্ভব হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীলতা বরং অনেক উপকারী হচ্ছে। রক্ষণশীল পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে গণবন্টন ব্যবস্থাকে। সেই রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা যেভাবে প্রসারিত করা হয়েছে, সেই ভাবেই খাদ্য-ভর্তুকির পথে এগোতে হবে। গত ৮ জুলাই 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় জীন ড্রেজ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন —কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার এবং ইউ পি এ সরকারের একটা বড় অংশ যে অর্থনৈতিক রক্ষণশীলতার পক্ষে, তার সবচাইতে বড় প্রমাণ হলো সোনিয়ার সাম্প্রতিক খাদ্য নিরাপত্তা বিল। জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে যে তাঁরা আশা করছেন ১৪ জুলাই-এর বৈঠকে বিলের অস্পষ্ট অংশগুলো নিয়ে তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করবেন সোনিয়া গান্ধী। পর্ষদের এক আধিকারিকের কথায়— "তিনি আমাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত সহযোগী। আমরা শুধু এটাই দেখতে চাই যে এই বিষয়টা নিয়ে তিনি কতদূর অগ্রসর হতে পারেন।" পর্ষদের ইঙ্গিত স্পষ্ট। মনমোহন সিং সাম্প্রতিককালে জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি করে যেভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে তড়িঘড়ি হেঁটেছেন, সেইপথ অনুসরণ করতে চাইছেন না সোনিয়া গান্ধী স্বয়ং। এর একটা কারণও রয়েছে। বিগত দু'-তিন বছর ধরেই ইউ পি এ সরকারের (প্রথম ও দ্বিতীয়) অর্থনীতি সুপার ফ্লপ করেছে। যে কারণে মুদ্রাস্ফীতি রেকর্ড ছুঁয়েছে, জিনিসপত্রের দাম এমনভাবে বেড়েছে যে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তার ওপরে মনমোহন-প্রণব এখনই যেভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে হাঁটতে চাইছে তাতে রাজনৈতিকভাবে যে কংগ্রেসের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে গত ৫ জুলাই-এর ভারত বনধই তার প্রমাণ।

ইতিমধ্যেই এই বিলটির স্বপক্ষে প্রচারে নেমেছেন কয়েকজন নামী অর্থনীতিবিদ। ড্রেজ তো এতে আছেনই। সেইসঙ্গে রয়েছেন অরুণা রায়, হর্ষ মান্দের ও এন সি সাক্সেনার মতো নামী অর্থনীতিবিদরা। ড্রেজ দায়িত্ব পেয়েই একটা মারাত্মক ত্রুটি ধরে ফেলেছেন। বিপিএল তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে অসংখ্য গলদ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। ২০০৪-০৫-এর আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষের গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের নাম বিপিএল তালিকাতে নেই। এক্ষেত্রে ছত্তিশগড় সরকার যে মডেল অনুসরণ করেছিল, সেই মডেলই অনুসরণ করতে চাইছেন ওই অর্থনীতিবিদরা। তাঁরা বেঁচে থাকার অধিকারটুকু অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে চাইছেন প্রতিটি গরীব মানুষের কাছে। সেই কারণে খাদ্য বিলে খাদ্য-সুরক্ষার বিষয়টাকে অগ্রাধিকারের তালিকায় রেখেছেন তাঁরা। সেইসঙ্গে বি পি এল তালিকাটাও যথাযথ সংশোধনের দিকে মন দিয়েছেন তাঁরা। 'হিট অর মিস' (হয় নাম ঢুকবে নয়তো বাদ যাবে) পদ্ধতিটা আরও মানবিক করে তুলতে চাইছেন তাঁরা। আপাতত ছত্তিশগড়ের 'অর্থনৈতিক মডেল'-ই ভরসা তাদের।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত : এক অনন্য জীবন

হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের জীবন। মাত্র ৪৮ বছর পাঁচ মাস জীবনকালের মধ্যে অনন্যসাধারণ নজির তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। বর্তমান প্রজন্ম জানে না যতীন্দ্রমোহন কে ছিলেন, কীভাবে জাতিকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি যখন রাজনীতিতে এসেছেন তখন দেখা গেছে, রাজনীতিতে এলে অর্থ-বিত্ত কমতো; যা যতীন্দ্রমোহনের জীবনে ঘটেছে। আর এখন রাজনীতিতে এলে অর্থবিত্ত বাড়ে। আর জাতি নীচের দিকে নামতে থাকে। যতীন্দ্রমোহনরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ছিলেন বলেই স্বাধীনতা এসেছে—বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই সত্যটা তুলে ধরতে হবে। শুধু বর্তমান প্রজন্ম কেন, তাঁর নেতৃত্বে অবিভক্ত ভারতে প্রথম শ্রমিক আন্দোলন ও প্রথম রেল ধর্মঘটের চেতনা আজকের রাজনীতিকরা যদি সামান্যতম অনুধাবন করতে পারেন, জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো আমাদের কঠিন হবে না।

যতীন্দ্রমোহনের জন্ম ১৮৮৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের কল্লোলিত শঙ্খনদীর ধারে বরমা গ্রামে। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত, মাতা বিনোদিনী দেবী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি দিকপাল যাঁরা জাতীয়তার মন্ত্রে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যাত্রামোহন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। জাতীয় কংগ্রেসে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল বাংলার অবিসংবাদিত নেতা। নানা উপলক্ষে এই নেতৃবৃন্দের অনেকেই চট্টগ্রামে যাত্রামোহনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে যাত্রামোহনের বাসভবন ছিল চট্টগ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। স্বাভাবিকভাবেই ছোটবেলা থেকেই যতীন্দ্রমোহন পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। যতীন্দ্রমোহনের মাতা বিনোদিনী দেবী ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা। কাজেই মাতাপিতার উদার মনোভাব তথা জন্মভূমি চট্টলার কঠিন-কোমল ভৌগলিক পরিবেশ যতীন্দ্রমোহনের জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল।

যতীন্দ্রমোহন প্রথমে হাজারি স্কুল ও পরে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। হেয়ার স্কুল থেকেই তিনি এনট্রান্স পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

যতীন্দ্রমোহন ১৯০৪ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডন যান। সঙ্গে গিয়েছিলেন বন্ধু সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, (পরবর্তীকালে বিখ্যাত চিকিৎসক, চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ)। স্বাধীন জীবিকার অভিপ্রায়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আইন পড়ার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাউনিং কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর

।। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত।।

বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্মীতা ও আলোচনা সভায় যুক্তিস্থাপনা সবাইকে মুগ্ধ করে। এসব গুণের জন্য তিনি ইন্ডিয়ান মজলিশ সোসাইটি ও ইষ্ট অ্যান্ড ওয়েষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখানে থাকাকালীন সঙ্গে ইংরেজ-দুহিতা নেলি গ্রে-র সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নেলি শুধু সহধর্মিনী হিসেবে নয়, তাঁর সংগ্রামী জীবনে যোগ্য সহযোগিনী ছিলেন। অ্যানি বেসান্ত, ভগিনী নিবেদিতা ও নেলি সেনগুপ্ত এই তিন মহীয়সী মহিলা আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে পরদেশের মুক্তি সাধনায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে নেলি সেনগুপ্ত একাধিকবার কারাবরণ করেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। ভারত সরকার ১৯৭৩ সালে তাঁকে পদ্মবিভূষণ-এ সম্মানিত করেন।

১৯১০ সালে যতীন্দ্রমোহন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ব্যারিস্টার হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯১১-র ডিসেম্বরে বঙ্গবিভাগ রোধ হয়। পরের বছর চট্টগ্রামে ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সবে রূপ পেয়েছে, এই পটভূমিকায় এই অধিবেশন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি যুবসমাজ এই অধিবেশনে নতুন উদ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি শুরু করেছিল।

চট্টগ্রামের এক বিশাল জনসভায় দেশবন্ধু যতীন্দ্রমোহনকে বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন থেকেই যতীন্দ্রমোহন দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক গুরু হিসাবে মেনে নেন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। যতীন্দ্রমোহন এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই অধিবেশনে অহিংসঅসহযোগ কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করে সারা জেলায় প্রচার ও সংগঠনের কাজে নামেন। শ্রমিক আন্দোলনে যতীন্দ্রমোহন নেতৃত্ব দেন এই সময়ে। বর্মা অয়েল কোম্পানি ইউনিয়ন-এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দেখলেন কর্তৃপক্ষ তাঁর সভাপতি হওয়া ভাল চোখে দেখেননি। তাই এই ব্যাপারে বিনোদ চক্রবর্তী নামে যে শ্রমিক নেতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। ফলে শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হন এবং প্রায় দু-হাজার শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করেন। যতীন্দ্রমোহন শ্রমিকদের শান্ত ও সংযতভাবে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে বলেন এবং নানাভাবে তাদের সাহায্য করেন। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করেন। শ্রমিকরা আইন অমান্য করে। ১৯২১ সালের ৪ মে গোটা জেলাব্যাপী হরতাল পালন করা হয়। বিশাল সভায় যতীন্দ্রমোহনের উদ্দীপ্ত ভাষণে শ্রমিকদের সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। বর্মা অয়েল কোম্পানির ম্যানেজার মার্টিন বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে আপস করেন। ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। যতীন্দ্রমোহনের খ্যাতি শ্রমিকদের মধ্যে এবং তথা সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হন।

দেশব্যাপী অসহযোগ-আন্দোলনের জোয়ারের সময়ে প্রথমে বর্মা অয়েল কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘট, পরে চা-শ্রমিকদের এই সংগ্রাম রেল শ্রমিকদেরও উৎসাহিত করল। এ বি রেলওয়ে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যতীন্দ্রমোহন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন। ২৫,০০০ রেলের শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ধর্মঘট পরিচালনা ও সাহায্য সংগ্রামের বিরাট দায়িত্ব যতীন্দ্রমোহন সাহসের সাথে গ্রহণ করেন। ধর্মঘটের ৪১ দিনে শ্রমিকদের এক বিশাল মিছিল যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এগিয়ে চলে। জেল ম্যাজিস্ট্রেট মিছিল বেআইনী ঘোষণা করে যতীন্দ্রমোহনসহ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার করে। চট্টগ্রাম শহরে হরতাল হয়। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। পর পর তিনটি সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট সারাদেশে এক ঐতিহাসিক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসাবে যতীন্দ্রমোহন জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেন।

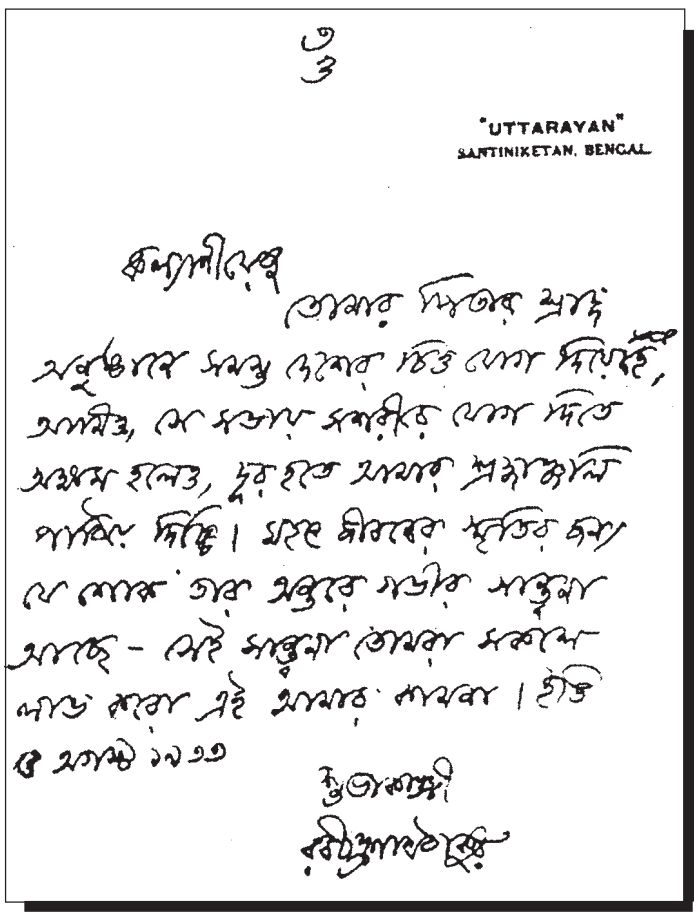

১৯২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্রমোহনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যেই দেশবন্ধু ১২ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন। যতীন্দ্রমোহন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর চট্টগ্রাম প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন ডাকেন।

১৯২২ সালে ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হন দেশবন্ধু। এখানেই আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে এবং বিপক্ষে নেতৃবৃন্দ বিভক্ত হন। গান্ধীজি 'নো-চেঞ্জার' হিসেবে থাকেন এবং দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরু 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করে আইনসভায় প্রবেশ করে বিরোধিতার পথ গ্রহণ করেন। যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, বীরেন শাসমল, কিরণশঙ্কর রায়, অনিলবরণ রায়, স্বরাজ্য দলে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। বাংলার স্বারাজ্য পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন যতীন্দ্রমোহন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবী সূর্য সেন ও তাঁর একান্ত সহযোগী অম্বিকা চক্রবর্তীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রেল কোম্পানির ত্রিশ হাজার টাকা ডাকাতির কেসে। তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য যতীন্দ্রমোহন এলেন চট্টগ্রামে। যতীন্দ্রমোহনের যুক্তি সমর্থন করলেন জুরিরা। ভাবীকালের অদ্বিতীয় বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী অম্বিকা চক্রবর্তীকে বেকসুর খালাস করতে পেরে যতীন্দ্রমোহনও হলেন তৃপ্ত।

১৯২৫ সালে ১৫ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনাবসান হয়। গান্ধীজি প্রস্তাব রাখলেন কোন একজন কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উত্তরাধিকারীরূপে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় স্বরাজ্য পার্টি ও কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন এই তিন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব এককভাবে গ্রহণ করবেন। গান্ধীজি যতীন্দ্রমোহনকে বললেন, 'কঠিন দায়িত্বভার বহন করবার শক্তি একমাত্র আপনারই আছে। আপনি রাজী হোন। সাহস, নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হোন'। যতীন্দ্রমোহন উপলব্ধি করলেন দেশবন্ধুর অসমাপ্ত কাজকে সম্পূর্ণ করতে হলে আরাম, বিলাস ও ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে জনসাধারণের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে হবে। গান্ধীজির নির্দেশ যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলেন।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভায় মেয়রের পদে প্রার্থীর জন্য যতীন্দ্রমোহনের নাম প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন গান্ধীজির নির্দেশ মেনে নিয়ে যতীন্দ্রমোহনকে মেয়র পদের প্রার্থী মনোনীত করেন।

১৯২৫ সালে ১৭ জুলাই। অধিক ভোটে দেশপ্রিয় জয়ী হয়ে মেয়র নির্বাচিত হলেন। যতীন্দ্রমোহন মেয়রের আসনে বসলে চারদিক থেকে অনেকে অভিনন্দন জানালো। এভাবে 'দেশবন্ধুর' ত্রিমুকুট 'দেশপ্রিয়' যতীন্দ্রমোহনের মাথায় শোভা পেল। এই সভায় যতীন্দ্রমোহন বললেন, 'যতদিন আমি মেয়রের পদে থাকবো দলের স্বার্থ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আমার কর্পোরেশনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে না'। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার কলকাতার মেয়র পদে (১৯২৫-২৬, ১৯২৬-২৭, ১৯২৭-২৮, ১৯২৯-৩০, ১৯৩০-৩১) নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মানিত পদে কেউ দুবারের বেশী নির্বাচিত হননি। সেদিক থেকে তিনি এক অনন্য নজির স্থাপন করেন।

এরপর ১৯২৮ সালে কলকাতায়

(এরপর ৯ পাতায়)

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে সমস্ত দেশের চিত্ত যোগ দিয়েছে, আমিও, যে সভায় সশরীরে যোগ দিতে অক্ষম হলেও, দূর হতে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠিয়ে দিচ্ছি। মহৎ জীবনের স্মৃতির জন্য যে শোক তার অন্তরে গভীর সান্ত্বনা আছে - সেই সান্ত্বনা তোমরা সকলে লাভ করো এই আমার কামনা। ইতি

৫ আগস্ট ১৯৩৩

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতীন্দ্রমোহনের পুত্রকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের চিঠি।

বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানে — সৌরশক্তি

প্রমোদ লাল ঘোষ।। আদিকালে মানুষ পেশীশক্তি এবং পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। ধীরে ধীরে মানবসভ্যতার অগ্রগতির পর ১৮৩১ সালে মাইকেল ফেরাডের বিদ্যুৎশক্তি এবং ১৮৭২ সালে জেমস্ ওয়াটের বাষ্পে ইঞ্জিন আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। তারপর আমাদের শক্তির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। প্রচলিত প্রথায় যে সমস্ত উৎসগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা শক্তি উৎপাদন এবং ব্যবহার করি সে সমস্ত উৎসগুলি ক্রমশ নিঃশেষিত হয়ে আসছে। এগুলির মধ্যে আছে ভূ-গর্ভে সঞ্চি ত কয়লা, তেল, গ্যাস, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি। ফলে আমাদের প্রগতির ও অগ্রগতির পথে বিরাট একটা প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শক্তির চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকলেও আমাদের শক্তি উৎপাদনের উৎসের ভান্ডার একেবারেই সীমিত। তাই বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত শক্তির উৎসগুলি ছাড়া অপ্রচলিত বা বিকল্প শক্তির উৎসগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের সভ্যতাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলির মধ্যে আছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈবশক্তি, ক্ষুদ্র জলশক্তি, জোয়ার-ভাটা শক্তি, জলের ঢেউশক্তি, ভূগর্ভস্থ তাপ শক্তি ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকল্প শক্তির কেন্দ্রবিন্দু হল সূর্য। প্রচলিত শক্তির উৎসগুলির

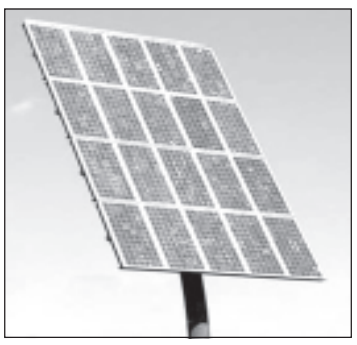

কেন্দ্রবিন্দুও সূর্য। তার পার্থক্যটা এই যে প্রচলিত শক্তির উৎসের ভান্ডার যেমন সীমিত, অপ্রচলিত শক্তির উৎসগুলির ভান্ডার কিন্তু তেমন সীমিত নয়।

সূর্য যতদিন থাকবে সূর্যের আলো, বাতাস, জোয়ার-ভাটা, জলের ঢেউ, জৈব প্রক্রিয়া ইত্যাদি ততদিন থাকবে। এই শক্তিকে আমরা সরাসরি ব্যবহার করে আমাদের শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পারি। এতে আমাদের সীমিত সঞ্চি ত শক্তির ভান্ডারের উপর নির্ভরশীল হয়ে আতঙ্কিত হতে হবে না। সূর্যের আলোর মাধ্যমে যে শক্তি পৃথিবীতে আসছে তাতে আমাদের পৃথিবীতে বর্তমানে যে পরিমাণ শক্তির চাহিদা আছে তার অনেক গুণ বেশী। তাছাড়া বায়ুশক্তি, জৈব শক্তি এবং অন্যান্য শক্তির উৎসগুলি তো আছেই। পূর্বে মানুষ হয়তো ভাবতে পারেনি যে পৃথিবীতে জ্বালানী সম্পদের ভান্ডার একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই এতদিন বিকল্প শক্তির উৎসগুলি নিয়েও মানুষ সেরকম ভাবে চিন্তাভাবনা করেনি।

গত শতাব্দীর মাঝমাঝি সময় থেকেই মানুষ দেখল এবং বুঝতে পারল যে আমাদের প্রচলিত শক্তির উৎসের ভান্ডার নিঃশেষিত হয়ে আসছে। তখন থেকেই বিকল্প শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্পশক্তির উৎসগুলিকে মানুষ কাজে লাগাতে শুরু করল। উন্নত মানের কারিগরী বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে বিকল্প শক্তির উৎসগুলিকে প্রচলিত শক্তির মতো রূপান্তরিত করার চেষ্টা করতে লাগল। কারণ মানুষ বুঝে নিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে বিকল্প শক্তির উপর নির্ভর করেই আমাদের শক্তির চাহিদা মেটাতে হবে। তাই গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর বিকল্প শক্তির ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। তার মধ্যে প্রধানত আছে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জৈব শক্তি ইত্যাদি।

সৌর শক্তি ঃ সূর্য থেকে সরাসরি যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে আমরা সৌরশক্তি বলি। কাজেই যে সূর্য সমস্ত শক্তির উৎস— সে সূর্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু আমরা প্রথমেই জেনে নেই।

(ক) বর্তমান অবস্থায় সূর্যের বয়স প্রায় পঁচিশ কোটি বৎসর।

(খ) সূর্যের মোট আয়ু ঃ প্রায় দুই হাজার কোটি বৎসর।

(গ) সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ঃ সর্বাধিক

(এরপর ১৫ পাতায়)

সহজে সৌরবিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের 'জওহরলাল নেহরু জাতীয় সৌর মিশন'-এর উদ্যোগে 'সৌরভারত' অভিযানের শুরু হয়েছে। ওই অভিযানে ১০০ কিলোওয়াট থেকে ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হবে। ফাঁকা ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর এই অভিযানে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে রাজ্য পুনর্নবীকরণ বিদ্যুৎ উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ (ওয়েবরেডা) বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, বাতাসে কার্বনের ঘনত্ব কমানোর জন্যে ভারত সরকার যে অঙ্গীকার করেছে তা মেনেই সরকারের এই পদক্ষেপ। যদিও সরকারকে এজন্য ভুর্তুকি দিতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার ভারতের জন্য উপযোগী বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন 'মিলেনিয়াম টেকনোলজি' পুরস্কার বিজেতা হেলসিঙ্কির জার্মান বৈজ্ঞানিক মিখাইল গ্রাজেল। তাঁর আরও বক্তব্য, সৌরবিদ্যুৎ সস্তা এবং তার উৎসও অফুরন্ত। এছাড়া এই বিদ্যুতের বিশেষত্ব হলো, নন-টক্সিক বা বিষবর্জিত। এবছর এপ্রিল মাসে ভারত সফরে এসে এখানকার প্রখর সূর্যতাপ দেখে শ্রী গ্রাজেল উৎসাহিত হন এবং এদেশের পক্ষে সোলার এনার্জিই বিকল্প গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে মন্তব্য করেন।

এক অনন্য জীবন

(৮ পাতার পর)

কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। যতীন্দ্রমোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। এই প্রথম সামরিক বেশে কুচকাওয়াজ করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

১৯২৯ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচনে যতীন্দ্রমোহন ৪ ভোটের ব্যবধানে সুভাষচন্দ্রের কাছে পরাজিত হন। এই নিয়ে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র পরের দিন যতীন্দ্রমোহনের বাড়িতে যান। সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে যতীন্দ্রমোহন ভিতরে নিয়ে গেলেন।

যতীন্দ্রমোহনের ইতোমধ্যে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়, ডাক্তারের পরামর্শে সমুদ্র পথে সিঙ্গাপুর যাত্রা করেন। ১৯৩০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ফিরতি পথে যখন তিনি সস্ত্রীক রেঙ্গুনে নামলেন, তখন অসংখ্য বর্মাবাসী ভারতীয় তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ২০ ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রা সহকারে যতীন্দ্রমোহনকে সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ২টি সভায় বক্তৃতা করেন। একটি বিষয় ছিল ভারত-ব্রহ্মদেশ মৈত্রী। ভারতে ফেরার পর ১৩ মার্চ বর্মার পুলিস রাজদ্রোহের অভিযোগে ওয়ারেন্ট নিয়ে গ্রেপ্তার করতে আসে। বর্মায় যতীন্দ্রমোহনকে নিয়ে যাওয়া হয়। ২২শে মার্চ বিচার শেষে তাঁর ১০ দিনের কারাদণ্ড হয়।

দেশপ্রিয়র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই রাজভবনের মার্বেল হলে যতীন্দ্রমোহন ও নেলি সেনগুপ্ত চিত্রিত যুগ্ম ডাকটিকিট (মুদ্রণ সংখ্যা ১৫,০০,১০০০) প্রকাশ করেন ভারতের যোগাযোগ মন্ত্রী রামনিবাস মির্ধা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত। স্বামী-স্ত্রী একই ডাকটিকিট প্রকাশ এটি হল দ্বিতীয় বার। প্রথম বার ১৯৬৯ সালে এই সম্মানে সম্মানিত হন মহাত্মা গান্ধী-কস্তুরবাই।

ইতিমধ্যে গান্ধীজি ডান্ডি অভিযান শুরু করেন এবং লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। ১৯৩০-এর ৩ এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন কলকাতায় ফিরে এলেন। ১১ এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন যখন সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ করতে থাকেন তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাবাসের সময়ে আবার তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হন। ২৫ অক্টোবর পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লি পরিদর্শন করে অমৃতসর আসেন। এখানে ৪ মাস কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ সালের ২৭ জানুয়ারি যতীন্দ্রমোহন মুক্তি লাভ করেন। যতীন্দ্রমোহন, নেলী সেনগুপ্ত ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুক্তি পেয়ে এক সঙ্গে কলকাতায় পৌঁছান।

১৯৩১ সালের আগস্ট উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে 'সঙ্কট' ত্রাণ সমিতি গঠিত হয়। যতীন্দ্রমোহন বন্যা ত্রাণে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে চট্টগ্রামে ভয়াবহ দাঙ্গার খবর আসে। পরের দিন এলবার্ট হলে তিনি দাঙ্গা বিধবস্ত চট্টগ্রামের কথা সভায় তুলে ধরেন।

১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী শিবিরে বন্দীদের উপর বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালায়, বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন এবং অন্ততঃ ১০ জন আহত হন। ২৮ সেপ্টেম্বর কর্পোরেশনের সভায় যতীন্দ্রমোহন বলেন — এই হত্যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ইচ্ছাকৃত এবং *দস্তার্হ নরহত্যা*। মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় অসুস্থ শরীর নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন এবং এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানান।

নিষ্ফল গোলটেবিল সেরে শূন্য হাতে গান্ধীজি ভারতে ফেরেন এবং চুক্তিভঙ্গের জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করেন। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজি, সুভাষ এবং শরৎ বসু গ্রেপ্তার হলেন। দেশের এই সকল ঘটনায় যতীন্দ্রমোহনকেও গ্রেপ্তার করা হলো। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অসুস্থ যতীন্দ্রমোহনকে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

যতীন্দ্রমোনের শরীর ক্রমশ আরো খারাপ হয়। কংগ্রেস নেতারা বারবার আবেদন করার পর ১৯৩৩ সালের ৫ জুন যতীন্দ্রমোহনকে রাঁচিতে গৃহবন্দী করে রাখার আদেশ দেওয়া হয়। স্ত্রী নেলি সেনগুপ্ত এবং ভাইঝি আইলিন ছাড়া কাউকে দেখা করতে দেওয়া হতো না। ১৯৩৩ সালে ২২ জুলাই রাত্রে যতীন্দ্রমোহন বন্দী অবস্থায় শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। কলকাতায় টেলিফোনে খবর আসে যতীন্দ্রমোহন আর ইহজগতে নেই।

পরের দিন রামরাজাতলা স্টেশনে, যতীন্দ্রমোহনের মরদেহ নামিয়ে শোভাযাত্রা করে হাওড়া টাউন হলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর শোভাযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ধর্মতলায় 'অ্যাডভান্স' কাগজের অফিসে, কলকাতা কর্পোরেশন, সেখান থেকে এলগিন রোডের বাসভবনে এবং শেষে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পৌঁছায়। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সন্তান দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২৫ জুলাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলকাতা ময়দানে এক মহতী জনসভায় দেশবাসী দেশপ্রিয়র প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

যতীন্দ্রমোহনের মহাপ্রয়াণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন তা এখনও প্রাসঙ্গিক—

'যতীন্দ্রমোহন দেশের সমস্ত বীর যোদ্ধাদের মধ্যে এমন একজন যিনি জন্মভূমির উন্নতিকল্পে কোনও বলিদানকেই বড় মনে করতেন না। তিনি তাঁর লাভজনক বৃত্তি ত্যাগ করে, সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে নিক্ষেপ করে সপরিবারে চরমতম কষ্টের জীবন বরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সদাচারী, হৃদয়গ্রাহী, সৌন্দর্যবোধ-সমন্বিত একজন মানুষ ও ভারতের প্রিয় রাজনৈতিক নেতা। ভারত তাঁর জাতীয় জীবনের এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে এমন একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বকে হারাল— যা আর পূরণ হবার নয়।

একজন রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে তাঁর দীর্ঘ কারাবাস, নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি ছিলেন শান্তি ও বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি, কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে, দেশের স্বাধীনতার বেদীতে আপন জীবন উৎসর্গ করতে উৎফুল্ল হতেন। এমন নির্দ্বিধায় প্রদত্ত মহাজীবনের স্মৃতি যুগপৎ ভারতের গৌরবের আর লজ্জার।'

তিনি ছিলেন যথার্থই এক মহান দেশপ্রেমিক। চারিত্রিক সততার এক বিরল আদর্শ তিনি আমাদের সামনে রেখে গেছেন। পাঁচবার মেয়র থেকেও কলকাতায় তাঁর কোনও নিজস্ব বাড়ি ছিল না। নিজের অর্জিত অর্থ সম্পদ তিনি দেশের জন্য ব্যয় করে গেছেন। শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও তাঁর জীবনে দেশপ্রেম ছিল অগ্রগণ্য। কোনও মানুষই অজাতশত্রু নন, দেশপ্রিয়ও অজাতশত্রু ছিলেন না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য তাঁর বর্ণময় জীবন সমকালীন অনেক বিশিষ্ট নেতৃত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণের চৌদ্দ বছর পর দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরেও দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়র মতো মহান জননায়কদের আশা আকাঙ্ক্ষা এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ১২৫ জন্মবর্ষে তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি আমারা বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

(গত ১৩.৪.২০১০, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্মারক বক্তৃতায় হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে গৃহীত।)

রাজ্য সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা

৬ আষাঢ়ের (২১.০৬-১০) পত্রিকায় ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিতের 'রাজ্য সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে আরও কিছু তথ্য সংযোজিত হলে ভালো হোত। ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচলিত তাতে মুসলিমদের পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা স্বীকৃত। মাদ্রাসায় কী পড়া হবে না হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সরকারের নয়। সরকার এ ব্যাপারে কখনওই হস্তক্ষেপ করতে পারে না। একসময় সরকারী কলকাতা মাদ্রাসায় অমুসলমান ছাত্রও ভর্তি করা হোত না। অসিত সরকার নামক এক সংগ্রামী শিক্ষক মামলা করে অমুসলমানদের সরকারি মাদ্রাসায় পড়ার অধিকার অর্জন করেন। এখন মাদ্রাসায় অমুসলমান শিক্ষক নিয়োগ ভালো চোখে দেখা হয় না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও ভারতের বেশীরভাগ মানুষ প্রতিমাপূজক। ইসলামি ভাষায় অংশীবাদী। মাদ্রাসায় কোরান হাদিস পড়া হয়, পড়ানো হয় ইসলামের ইতিহাস। কোরান হাদিসে অংশীবাদীদের জন্য কোনও ভালো কথা নেই। আর মাধ্যমিকের টেস্টপেপার খুললে মাদ্রাসার ইতিহাস পত্র দেখা যায়। তাতে পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্ন ইসলামের ইতিহাসের উপর। প্রশ্নপত্রে নানা যুদ্ধের উপর প্রশ্ন থাকে— বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ —প্রতিটি যুদ্ধই প্রতিমাপূজকদের বিরুদ্ধে জেহাদ। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় সংহতির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। হাজারটা আধুনিক বিষয় পড়ালেও এই দোষ থেকে বিমুক্ত হওয়া যাবে না।

মুসলিমরা বাঙলার রেনেসাঁয় অংশগ্রহণ করেনি। ওই সময় 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া' আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিল তারা। ওই আন্দোলন শাহ ওয়ালিআল্লাবাদের দ্বারা জারিত। পূর্ববঙ্গে চলছিল ফরাজী আন্দোলন। ১৮৩৭ সাল অবধি ফার্সী ছিল রাজভাষা। ফলে চাকরী পাওয়ার জন্য ইংরেজী পড়ার আবশ্যকতা ছিল না। ফলে মুসলমানদের চাকরীর অভাব হয়নি। সৈয়দ আহমদ খাঁ একবিন্দু ইংরেজী জানতেন না। আর আমাদের রেনেসাঁর ভিত্তি ইউরোপীয় আলোকায়ন, হিতবাদী দর্শন। এই সবের ভিত্তি আবার পশ্চিম ইউরোপের ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট খৃষ্টধর্ম। রেনেসাঁর সমতালে বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্মের প্রসার ঘটে।

সিপাহী বিদোহের সময় সৈয়দ আহমদ তরিকা আন্দোলনের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেন। কারণ, তিনি দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনও ক্ষমতাই ছিল না কবি ও কল্পনাবিলাসী সম্রাটের। আর মির্জা গালিব তাঁকে ইংরেজপ্রেমী করে তোলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভঙ্গুর ইসলামি জাতিকে ভারতের ইতিহাসে পুনরায় প্রাসঙ্গিক করে তোলাই স্যার সৈয়দ আহমদের বিরাট কীর্তি। মুসলিমরা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী, এই বক্তব্যের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং সৈয়দ আহমদ। এবং তিনিই এই বক্তব্যকে সুকৌশলে ছড়িয়ে দেন সাধারণের মধ্যে। ঘটনা হচ্ছে, কিছু মুসলমান যেমন ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করতো, তেমন কিছু হিন্দুও ইংরেজী স্কুলে না গিয়ে টোল-চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করতো। কোনও কোনও হিন্দু জমিদার নন্দন আবার সে পরিশ্রমটুকুও করতে রাজী ছিল না। পরিসংখ্যান চর্চা করে দেখা যায় ১৮৮২ থেকে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে সৈয়দ আহমদের আলিগড় কলেজ থেকে পাশ করা মুসলিম স্নাতকের সংখ্যা ১২২, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মুসলিম স্নাতকের সংখ্যা ২৫০। সৈয়দ আহমদের অন্যতম জীবনীকার হাফেজ মালিক বলেছেন, আহমদ না জন্মালেও মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার সম্প্রসারণ একই গতিতে ঘটতো। শুধু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কেন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের মুসলমানরাও ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিল, আহমদের আন্দোলন তো অত দূর বিস্তারলাভ করেনি। আহমদের জীবৎকালে আলিগড়ের উৎপাদন যে একরকম হতাশাজনকই ছিল সে পরিসংখ্যান আগেই দিয়েছি। আহমদের মৃত্যুর পরবর্তীকালে ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ খৃস্টাব্দের পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যায় সারা ভারতে মুসলিম স্নাতকের সংখ্যা ১১৮৪, তার মধ্যে আলিগড়ের উৎপাদন ২২০, এলাহাবাদের ৪১০, কলকাতার ৩৯৮, পাঞ্জাবের ২৫৫।

ডঃ রক্ষিত শৈলেন্দ্রনাথ সেনের প্রদত্ত তথ্যের সময়কাল দেননি। ২২টি মুসলিম গ্রাজুয়েট কোন সময়ের? বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে গ্রামীণ মুসলমানরা ছিল নিম্নবর্গের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। সমবর্গের হিন্দুরাও পড়াশুনা করতো না। এইটাই এখনকার মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ। সাচার কমিটির প্রতিবেদনে যে রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গেছে শিক্ষাক্ষেত্রে তপশিলীভুক্ত জাতি ও মুসলিমদের অবস্থান সমান।

—রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা।

প্যাটেল ও দেশভাগ

দেশভাগের ব্যাপারে সর্দার প্যাটেল অন্ততঃ নেহরুর মতো দায়ী ছিলেন না—'Jinnah : India-Partition-Independence' গ্রন্থে যশোবন্ত সিংহের উক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত 'প্যাটেল ও দেশবিভাগ' শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ৯.১১.২০০৯) পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'আমাদের সর্দার প্যাটেল' সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, সর্দার প্যাটেল আগে একবার কংগ্রেস ত্যাগ করবেন বলেছিলেন। কিন্তু, তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে আমৃত্যু কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিলেন। পাঁচুগোপালবাবুর বইটি পড়িনি;রক্ষিত মহাশয়ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটি বিস্তারিত বলেননি। ফলে, আমাদের কাছে বিষয়টি ধোঁয়াটে হয়ে রইল। তবে, K.L. Panjabi-ßÔÂîÂ 'The Indomitable Sordar' সূত্রে জানা যায়, সর্দার প্যাটেল একবার, কংগ্রেস নয়, 'কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব' ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজী তখন তাঁর 'অন্তরাত্মা'-র (Inner Voice) ডাকে সাড়া দিয়ে ১৩ জানুয়ারি থেকে দিল্লীতে বসে 'আমরণ' অনশন শুরু করেছিলেন। তাঁর দাবি মেনে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়ার পরও তাঁর অনশন-পর্ব চলছিল। এমনিতেই মন্ত্রিসভায় প্যাটেল নানাভাবের বিরোধিতা, বিশেষ করে, মওলানা আজাদের বিরূপ মানসিকতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। উপরন্তু, গান্ধীজীর ওই অনশন-কাণ্ডের জন্যও প্যাটেলকে দায়ী করা হচ্ছিল। ফলে, তিতিবিরক্ত হয়ে তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে গান্ধীজীকে লিখেছিলেন (তাং, ১৬-১-১১৪৮)—"....The Maulana (Azad) too is displeased with what I am doing and you have again and again to take up cudgels on my behelf. This is also intolerable to me. In the circumstances, it will perhaps be good for me and for the country if you now let me go. I cannot do otherwise than what I am doing...And if still I stick to office, it would mean–at least that is how I would feel–that I let the lust of power blind my eyes and so unwilling to quit...I Know, it is no time for argument while you are fasting. But since I can be of no help even in ending your fast, I do not know what else there is for me to do...(ওই, পৃঃ ১৭৩)।

উল্লেখ্য, কাথিয়াবাড় রাজগোষ্ঠীর জটিল সমস্যার কিনারা করে দিল্লী ফিরে প্যাটেল ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর সাথে দেখা করেছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারে খোলাখুলি কথাবার্তার পর গান্ধীজী তাঁকে বলেছিলেন—পূর্বে একবার তিনি—সর্দার বা পণ্ডিত নেহরু—দুজনের যে কোনও একজনের মন্ত্রিসভার বাইরে থাকার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নিশ্চিত যে, দেশের সার্থে দু'জনই মন্ত্রিসভায় অপরিহার্য। লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তাঁকে বিশেষভাবে বলেছেন, ভাবাবেগপ্রবণ একজন ব্যক্তির নির্মোহ বাস্তববাদী সহযোগীর বিশেষ প্রয়োজন আছে—("...it is desireable that the inpatient idealistic with his head it the clouds should woek hand in hand with one who have his feet firmly planted on the earth; an ideal combination for the country"—/ওই, পৃঃ ১৭৬)।

নিবন্ধের উপসংহারে, রক্ষিত মহাশয় কটাক্ষ করে বলেছেন—জিন্না ও নেহরুর মতো প্যাটেলও ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, সেই সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল "মাত্র তিন পুত্রের জন্য"। মনে হয়, লেখকের অন্যমনস্কতা বা ছাপার ভুল, যে কারণেই হোক, কথাটি 'তিন বছরের জন্য' না হয়ে 'তিন পুত্রের জন্য' হয়ে গিয়েছে। সে যাক, কিন্তু ক্ষমতা বা অর্থের লোভ-লালসা বল্লভভাই প্যাটেলের কোনদিনই ছিল না। ১৯৪৬ সালের কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য ১২টি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সর্দার প্যাটেলের নাম সুপারিশ করেছিল;পণ্ডিত নেহরুর ঝুলিতে ছিল মাত্র ৩টি কমিটির সুপারিশ। ওইরূপ অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও 'বাপুজী'-র কথা শিরোধার্য করে তিনি নেহরুর অনুকূলে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।—(ওই, পৃঃ ১৬৬)।

প্রসঙ্গতঃ, সর্দার প্যাটেলের মহৎ চারিত্রিক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি। ঘটনাটির কথা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৯০০ সালে বল্লভভাই আইনজীবী হয়ে জেলা আদালতে যোগ দেন। তাঁর বাসনা ছিল, ব্যারিস্টার হবেন। মিতব্যয়ী বল্লভভাই তিন বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করে বিলাতযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু, অগ্রজ বিঠ্ঠলভাই বাগড়া দিয়ে বল্লভভাইকে বলেন—নীতি-নৈতিকতা ও ঐতিহ্য মেনে আগে তাঁরই যাওয়া উচিত ('by all the canons of morality and tradition the elder brother should go first')। আইনজীবী বিটঠলভাইয়েরও পসার ছিল; কিন্তু সঞ্চয় ছিল না। বল্লভভাই নীরবে অগ্রজের অনুশাসন মেনে নিয়ে জাহাজের টিকিট ও সঞ্চিত দশ হাজার টাকা তাঁকে দিয়ে বলেছিলেন—'The money and the passage are at your disposal. Take them and if you need more money in England. I will send it to you'—(ওই, পৃঃ ১৩-১৪)। ১৯০৮ সালে বিঠ্ঠলভাই পুরাদস্তুর ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলে বল্লভভাই নিজ ব্যয়ে ১৯১০-এর আগস্টে বিলাতযাত্রা করেন এবং ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ সালে সসম্মানে ব্যারিস্টার হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা বাহুল্য, বল্লভভাই প্যাটেল একজন সফল ব্যারিস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন—('as a defence lawyer he was in great demand')। আমরা অনেকেই ওইসব ছোটখাট কিন্তু তাৎপর্যব্যঞ্জক ঘটনাগুলির হিসাব রাখি না।

সীমিত পরিসরে রক্ষিত মহাশয়ের অভিযোগ সমূহের আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু একটি কথা। দেশভাগ মেনে নেওয়া যে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতা, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তবে, দেশভাগের অভিযোগে তাঁদের যাঁরা কাঠগড়ায় তুলতে সদা তৎপর, তাঁরা জানাতে পারেননি, কীভাবে কোনও পথে এগোলে দেশভাগ না করেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বৃটিশদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করা যেত। আমরাও তাই বুঝতে পারছি না। তড়িঘড়ি ক্ষমতার লোভে, না উপায়ান্তরহীন হয়ে কংগ্রেসী নেতারা দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০।

চিঠিপত্র

ভূপালে ক্ষতিপূরণে মূল্যবৃদ্ধি

অতি সম্প্রতি পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এর ফলে বাড়তে চলেছে বাসভাড়া ও পণ্যমাশুল। অর্থাৎ আবার একপ্রস্থ মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেসের হাত শক্ত করে যে দেশবাসী তাদের জয়যুক্ত করেছিল তাদের আবার এক নতুন সঙ্কটে ফেলে দিল 'আম-আদমী কা সরকার।' কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি যাতে করে এই পরিমাণ তেলের মূল্য বৃদ্ধি করতে হোত, অর্থাৎ কেন্দ্র সরকার ভরতুকি নাকি হ্রাস করছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন এই ভরতুকি হ্রাস?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার জন্য যে ব্যক্তি দায়ী ছিলেন তাকে অতি সুকৌশলে ভারত থেকে পলায়ন করতে সাহায্য করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। অর্থাৎ দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের যার ক্ষতিপূরণ যার দেওয়ার কথা তাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে বের করে দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কাছে নতি স্বীকার করে ১৫০০ কোটি টাকার ত্রাণ সাহায্য ঘোষণা করেছে সরকার। কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা আসবে কোথা থেকে? তাই করা হোক একপ্রস্থ তেলের মূল্যবৃদ্ধি। এছাড়া বেসরকারী তেল কোম্পানীগুলোকে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিও কাজ করল এই মূল্যবৃদ্ধির পিছনে। অর্থাৎ রাজীব গান্ধীর কৃত পাপের বোঝা বইতে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু আর কতদিন এই গান্ধী পরিবারের পাপের বোঝা বইব আমরা?

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

রুকবানুরের পরাজয়

সম্প্রতি পৌর নির্বাচনে মমতা হাওয়ায় সিপিএম ধরাশায়ী, এরই মধ্যে সকলের অগোচরে একটা মহাবিপ্লব ঘটে গেল, মমতার নয়নের মণি রিজওয়ানুরের দাদা রুকবানুর রহমান ও দিদির প্রোজেক্ট করা ভাবী মেয়র জাভেদ খানের পরাজয়। গত বছরই মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্র প্রসাদ নামে জনৈক হিন্দু মনেরা খাতুন-কে বিয়ে করার অপরাধে মনেরার আত্মীয়দের হাতে জবাই হন। বারাসতে অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় রেহেনা সুলতানাকে বিয়ে করার অপরাধে রেহেনার ভাই অর্কের গায়ে এক জেরিকেন কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই দুটো ঘটনা নিয়ে মমতা একবারের জন্যও মুখ খোলেননি। যে রিজওয়ানুরের জন্য হাজর হাজার লোক মোমবাতি জ্বালালো, দিনের পর দিন পদযাত্রা, পথ অবরোধ, সভাসমিতি করলো, তাহলে ভোটের সময় সেই ভোটাররা গেল কোথায়? খাস কথা হলো ৬৫নং ওয়ার্ডের হিন্দু ভোটাররা এককাট্টা হয়ে দলমত নির্বিশেষে রুকবানুরকে ভোট দেয়নি, তারা ভোট দিয়েছে আর এস পি প্রার্থী সুনীল শর্মাকে। ওই ওয়ার্ডে মোট ভোটার এর সংখ্যা ৫০১৮৫-এর মধ্যে হিন্দু ভোটার ১৫৮১৪ জন। তারা মমতা আপার মুসলিম তোষণ একদম পছন্দ করেননি বলেই আপাকে শিক্ষা দেবার জন্য একটা সঙ্কেত দিয়েছে মাত্র। মমতা আপা এর থেকে শিক্ষা নেবে কিনা জানি না। মুসলিম তোষণকারী সংবাদ পত্র এবং টি ভি চ্যানেলগুলি এখনই প্রচার করছে যে রুকবানুর বিরোধী পক্ষের জমানত জব্দ করে জিতেই গিয়েছে, এবং রুকবানুর ডেপুটি মেয়রের পদ অলঙ্কৃত করবেন। কিন্তু হিন্দু ভোটাররা মমতা আপার বাড়াভাতে ছাই দিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী এই সঙ্কেত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কিনা এটাই এখন দেখার বিষয়।

—রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলকাতা-৬৪।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — স্বঃ সঃ

কৃপা হি কেবলম্ রামকৃষ্ণ শরণম্

অর্ণব নাগ

পুকুরের জলে পড়েছে একটা আস্ত থান ইঁট। একটা ঘূর্ণাবর্ত। নিস্তরঙ্গ পুকুরে রকমারি তরঙ্গ। পুকুর? কোন অর্বাচীনে বলে পুকুর? ব্যাটা বল ভাবসাগর। ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যে। যতই বাবুয়ানি দেখাও, ডুব তোমায় দিতেই হবে। কারুর কৌতুক—আপনি রজোগুণী লোক বড় ভালবাসেন। সহাস্য ঠাকুর—তবে নরেনকে কেন ভালবাসি? তার তো এখন নুন দিয়ে কলাপোড়া খাবার জো নেই। রজোগুণী রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। বাড়ি উত্তর কলকাতার বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে। ঠনঠনে মিত্রবাড়ির আদিপুরুষ। উচ্চ শিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত। তদানীন্তন বাংলা গভর্নমেন্টের প্রথম ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের উচ্চপদে নিযুক্ত। তায় বৃটিশদের দেওয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধিখানি নামের শোভাবর্ধন করছে। তাঁর মনে একটা

ঠাকুরের পদচিহ্ন

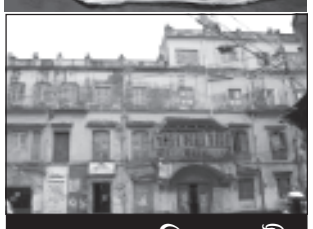

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটী

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের বংশধর ঋষিণ মিত্র বলছেন— এ বাড়িতে এসে এই ঘরেই প্রথম বসেছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ(দেব। ওপরে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। ছবি— শিবু ঘোষ

সংশয়— 'কেশব কি আসবে?' তৎকালীন যুব সমাজের আদর্শ কেশব চন্দ্র সেন। ব্রাহ্মসমাজের মাথা। সেই মুণ্ড হেঁট হয়ে ঠাকুরের পদে আনত। গুরু শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব। কে যেন স্মরণ করাল ব্রাহ্মভক্ত ভাই অঘোরনাথের মৃত্যু-সংবাদ। তাই কেশবের আসা নিয়ে মনে একটা সংশয়ের বাজনা। মনে পড়ছে রাজেন্দ্রর —কেশব সেনেই হপ্তাখানেক পূর্বে মনোমোহনের বাড়িতে এসে বলেছিল আপনার বাড়িতে একদিন উৎসব হলে বেশ হয়। আজ সেই দিন। ২৬ অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ (ইং ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮১ খৃস্টাব্দ)। ঠাকুর আসছেন তাঁর কৈশোরের লীলাভূমি ঝামাপুকুরে। দ্বিপ্রহরে খানিক বিশ্রাম তাঁর 'রেস্টহাউস' মনোমোহন মিত্রের বাড়িতে। ধরলো রসদদার সুরেন্দ্র—'আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন—চলুন।' বেঙ্গল ফটোগ্রাফার স্টুডিও-তে ছবি তোলা হচ্ছে ঠাকুরের। দেখছেন তিনি। দেখতে দেখতেই ভাবসমাধি হলো। অপূর্ব নিশ্চল স্থানুবৎ মূর্তি। আজ ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে। পরে কেশব সেন-কে ঠাকুর বলেছিলেন—"আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাচের ওপর ছবি থাকে না। কাচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না। আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়; যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলো ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।"

এদিকে দুই শ্যালিকা-পুত্র রাম ও মনোমোহনকে নিয়ে শোক-সন্তপ্ত কেশব চন্দ্র সেনের কাছে উপস্থিত রাজেন্দ্র। নিমেষে ভুল ভাঙল। ঠাকুর আসবেন, অথচ কেশব থাকবেন না, তাই কখনও হয়! তিনি যাবেন তবে অশৌচ বলে আলাদা পংক্তিতে বসে খাবেন।

ঝামাপুকুরকেই পুকুর বলছো না কি? ঘাড়ে ক'টা মাথা? এ যে আস্ত একটা সাগর। রামকৃষ্ণ ভাবসাগর। ঠাকুরের লীলাভূমি। প্রাক-দক্ষিণেশ্বর পর্বে প্রস্তুত হওয়া ভাবসাগর। দক্ষিণেশ্বর পর্বে থান ইঁট পড়বে। পুকুর জুড়ে ভীষণরকম তোলপাড়। একটা তরঙ্গ উঠবে। দক্ষিণেশ্বর-উত্তর পর্বে সেই তরঙ্গ আলোড়ন ফেলবে সুদূর শিকাগোয়। ঠাকুর আসছেন রাজেন্দ্র মিত্রের ১৪ নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে। ভাবসাগরে ত্যাগীরা ডুব দেয়, ভোগীরা ডুব দিতে পারে না কি? ভোগীদের কত বন্ধন। ঠাকুর বলেছেন, বাগবাজার পুলের মতোন। একটা বন্ধন ছিঁড়লে কিছু হবে না। অন্যেরা ঠিক টেনে রাখবে। তবে একটা মিডিয়াম দরকার। মিডিয়াম মানে মাধ্যম। ঠাকুর বলেছেন—

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়

(এরপর ১৪ পাতায়)

গুরু এবং গুরুপূর্ণিমা

অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়

যিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীকে দান করে শিক্ষার্থীর দেহ মন প্রাণ এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ ঘটাতে পারেন সার্বিক অর্থে তিনি গুরু। সার্বিক অর্থে বলার কারণ হলো, পাঠশালায় যিনি অক্ষর পরিচয় করান তিনি গুরুমশাই। একজন অভিজ্ঞ কাঠের কাজ জানা মানুষের কাছে যে কাজ শেখে, সেই শিক্ষার্থীর কাছে তিনি গুরু। এমনি ভাবে যারা গান শেখান, আঁকা শেখান তাঁরা সকলেই এককথায় গুরু। কিন্তু হিন্দুর আচার আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাধন ভজন সব কিছুই গুরু নির্ভর। তিনিও শিক্ষা দেন। সে শিক্ষা আধ্যাত্মিকতার। সমস্যা তৈরি হয়েছে এখানে। গুরুবাদী হিন্দুধর্মে গুরুরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেছে যাতে অহিন্দুরা এখন বিদ্রূপ করার সুযোগ পাচ্ছে। হিন্দুধর্ম বিশাল বনস্পতির মতো, তার শাখা-প্রশাখা বহুবিস্তৃত। এই বিস্তৃতির সুযোগে কিছু চতুর মানুষ মুক্তি মোক্ষ স্বর্গ প্রাপ্তির চুষিকাঠি হাতে নিয়ে ধর্মের নামে শিষ্যের বিত্ত হরণ করছে। অন্য ধর্ম দূরের কথা, হিন্দু ধর্মের অনেকেই এখন গুরু বিমুখ হয়ে পড়ছেন। কেউ কেউ গুরু বাদ দিয়ে নিজের মতো করে সাধন ভজন করার চেষ্টা করছেন। হিন্দু এখন গুরুর দুই জাত ঠিক করেছে—সদ্‌গুরু এবং অসদ্‌গুরু।

শাস্ত্র কিন্তু গুরুর কোনও জাত নিরূপণ করেনি। গুরুনাম নিয়ে প্রবঞ্চক যারা তারা হিন্দুধর্মকে কলুষিত করছে। এই সব কারণে আজকাল হিন্দু হয়ে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে অনেকে লজ্জা পায়। অথচ শাস্ত্রবাক্য হলো—

হিন্দুদুষ্টমৃহঃ প্রোক্তোহনার্য নীতি বিদুষকঃ
সদ্ধর্ম পালকো বিদ্বান্ শ্রৌত ধর্মপরায়ন

সেই হিন্দু যে দুষ্টের দণ্ডদাতা, অনার্য নীতির বিরোধী সদ্ধর্মের পালক শ্রুতির অনুসরণকারী।

এ ধর্মের প্রথম এবং শেষকথা জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। সবার মধ্যে এই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। তাঁকে জানাই জীবনের পরম লক্ষ্য। সূত্রাকারে বলা হয়— আত্মানং বিদ্ধি। এই আত্মাকে জানতে হলে তাঁর কাছে যেতে হয় যিনি তাকে জেনেছেন। গুরুমশাই বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতে পারেন আগে তিনি জেনেছেন বলে। কিন্তু আত্মা তো কোনও দৃশ্য বা শ্রব্য নয়। কাউকে হাতে কলমে দেখানোও যাবে না। তবু হিন্দু সাধারণ মানুষও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে একটি প্রাণবান দেহের মধ্যেই তিনি আছেন। কিন্তু তাকে প্রত্যয়ে আনতে একজন পথ প্রদর্শক দরকার। হিন্দুধর্মে এই মহান কাজটি যাঁরা করেন তাঁরাই গুরু। একদিন এই গুরুকেও শিক্ষার্থীরূপে অন্য গুরুর কৃপা প্রার্থনা করতে হয়েছিল।

জ্ঞান কর্ম ভক্তি— এই তিনটি পথের যে কোনও একটিতে গেলে তাঁকে জানা যায়, শিক্ষার্থী বা শিষ্যের আধার কোন পথের যোগ্য তা নির্বাচন করে যথোপযুক্ত সাধন ব্যবস্থা যিনি দিতে পারবেন তিনিই প্রকৃত গুরু।

বেদ বা জ্ঞান সৃষ্টির কাল থেকেই এই দান গ্রহণের কাজ চলে আসছে। হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্য গুরু পরম্পরা। কোনও হিন্দু পূজায় বসলে—পঞ্চ দেবতার প্রথম দেবতা গণেশ পূজার আগে গুরু পূজা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরু পরম্পরাকেও নমস্কার জানাবেন। গুরু পরম গুরু— পরাপর গুরু পরমেষ্টি গুরু, সংক্ষেপে এই গুরু পরম্পরা অর্থাৎ দেহধারি গুরু থেকে হৃদয় মধ্যে জ্যোতির্ময় গুরু অর্থাৎ আত্মাকে ক্রমানুসারে উপলব্ধি করবার প্রার্থনা জানাতে হবে। কেবল মাত্র জ্যোতি কেবল আনন্দধারা চিন্তা করা সহজসাধ্য নয় বলেই প্রথমে দেহধারি ব্রহ্মবিদ্ একজনকে মানতে হয়।

পুরাণ মতে বেদ সৃষ্টি করে ব্রহ্মা, সনক-

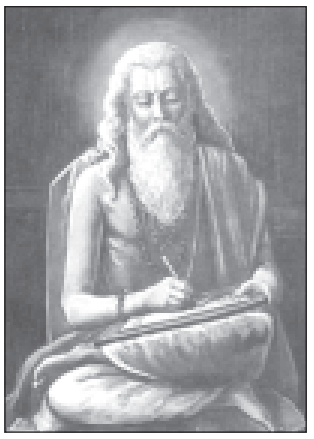

।। গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত ।।

সনন্দন সনৎ কুমার ও সনাতন—এই চারজনকে অর্পণ করলেন। বলা হয় এঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। শিষ্য পুত্রের সমান। গুরু

পরম্পরা

পুত্র স্নেহে ও অনুশাসনে শিক্ষা দেবেন এখানে তারই ইঙ্গিত। এঁরা অত্রি অঙ্গিরা মরীচি পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু এই সাত জনকে দিয়ে গেলেন। এঁরা আবার তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন। এঁদের একজনের নাম সাকলাচার্য। পরম্পরা ক্রমে এই বেদজ্ঞান এল ব্যাসদেবের কাছে। মানুষের কাছে সহজ করতে অখণ্ড বেদকে চারটি ভাগে ভাগ করলেন তিনি। বেদজ্ঞান মানুষের কাছে সুলভ করতে ব্যাসের এই কীর্তির জন্য তাঁকে গুরু রূপে বরণ করল হিন্দু সমাজ। তাই তাঁর আবির্ভাব দিবসটি গুরু পূর্ণিমা নামে পরিচিত।

ব্যাসের কাছ থেকে তাঁর পুত্র শুকদেব এবং এই পরম্পরা অনুসরণ করে, গৌড়পাদ এবং তাঁর শিষ্য গোবিন্দপাদ হয়ে চলে এসেছে শঙ্করাচার্যের কাছে। শঙ্করাচার্য বেদের ভাষ্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে, এক একটি মঠে এক একটি বেদের অনুশীলনের নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরী গিরি ভারতী প্রভৃতি দশটি সম্প্রদায়ে সমস্ত সাধু সন্তের শ্রেণীভাগ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। যে যে পথের পথিক, তাকে যাচাই-বাছাই করে সাধন পথে নির্দিষ্ট ক্রমে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসেছিল মানুষের কাছে। আর এই সুযোগই গ্রহণ করেছে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে কিছু প্রতারক। এরা সংখ্যায় এখন অনেক বেশী। বিত্তের বিনিময়ে সাধন এদের কাছে সহজলভ্য। এদের জন্যই হিন্দুধর্মে আজ নানা অনাচার মিশেছে। সমস্ত হীনতার উর্দ্ধে যে হিন্দু, সে আজ নিজেকেই হীন মনে করছে। এর সঙ্গে আছে কুলগুরু নামধারী একদল ভ্রষ্ট সম্প্রদায়। সুপ্ত কুল কুণ্ডলিনীকে যিনি জাগাতে সক্ষম তিনিই কুলগুরু, আজ কুল অর্থে বংশ পরম্পরা ধরে নিয়ে অপদার্থ এবং কদাচারিও কুলগুরু হিসাবে সম্মান দাবি করছে। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ এদের হাতে সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

গুরু পূর্ণিমা অর্থাৎ ব্যাসদেবের আবির্ভাবের দিনটি মানুষকে সচেতন করার জন্য সর্বস্তরেই পালিত হওয়া দরকার। এখন যাঁরা শিষ্য তাঁরা যেমন গুরুপূজা করবেন, তেমনই এখন যাঁরা গুরু তাঁরাও তাঁদের গুরুকে স্মরণ মনন পূজন করবেন। গুরু পূর্ণিমার এটাই রীতি। এই স্মরণ মননে আমরা পরম্পরা ক্রমে একদিন হৃদয়ে জ্যোর্তিময় আসনে আসীন গুরুকে উপলব্ধি করতে পারব। সেদিন দেখব গুরু এক। গুরুই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। তিনিই পরব্রহ্ম, তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। আমরা বুঝতে পারি না। সম্ভবতঃ তাই কবি বলেন—

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমায়
কেমনে কিছু না জানি
অর্থের শেষ পাই না তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী—

এই অবস্থা থেকে কেবলমাত্র সদ্‌গুরুই আমাদের বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নেবেন। গুরু পূর্ণিমা তারই শুভারম্ভ।

পেশার সুলুক-সন্ধান : আকুপাংচার

অতি প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি আকুপাংচার। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে হয়ে আসছে এই সূচিভেদ চিকিৎসা। পেশা হিসেবে বেছে নিতে কী করা উচিৎ, তারই সুলুক সন্ধান দিয়েছেন নীল উপাধ্যায়

এদেশে আকুপাংচার চিকিৎসার শিক্ষায় কোনও ডিগ্রি কোর্স নেই। কেবল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। পাশ করা চিকিৎসকরা এবং উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণরা এই কোর্স নিয়ে পড়াশুনো করতে পারেন। এক বছরের সংক্ষিপ্ত কোর্সের পাশাপাশি ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সও চালু আছে। এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজির সঙ্গে অকুপাংচারের তথ্য ও প্রয়োগ এক বছরের মধ্যে শেখানো হয়। সার্টিফিকেট কোর্স পড়ে আংশিক আকুপাংচার চিকিৎসক হিসেবে ডাক্তারদের সহকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে অনেকে কাজ করছেন।

কোথায় শেখানো হয় ঃ স্বীকৃত ও আংশিক ডাক্তার উভয়ের জন্যেই বিভিন্ন ধরনের কোর্স করানো হয়—

(১) ইন্ডিয়ান রিসার্চ ইন্সটিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন (ইরিম)-এ সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে। আছে ৪ মাসের সংক্ষিপ্ত কোর্স।

(২) কলকাতা আকুপাংচার মেডিকেল কলেজে ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স।

(৩) ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটিতে (ইগনু) স্নাতকোত্তর কোর্স স্বীকৃত ডাক্তারদের জন্য।

কোর্সের খরচ ঃ (১) ইরিম-এ সার্টিফিকেট কোর্সের খরচ স্বীকৃত ডাক্তারদের ক্ষেত্রে ৪ হাজার টাকা (২) আকুপাংচার মেডিকেল কলেজে ৪০ হাজার টাকায় কিস্তিতে ৩ বছরের কোর্স পড়ানো হয়। (৩) ইগনুতে স্বীকৃত ডাক্তারদের ১ বছরের কোর্স করানো হয় ২০ হাজার টাকায়।

পেশাগত দিক থেকে ঃ সরকারি হাসপাতালে আকুপাংচার চিকিৎসায় নিয়োগ বাড়ছে। বিভিন্ন এন জি ও সংগঠনে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবেও কাজের সুযোগ আছে। পঞ্চায়েত স্তরে আকুপাংচার চিকিৎসায় নিয়োগ বাড়বে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসার সুযোগ কম, সেখানে আকুপাংচারের চাহিদা বাড়ছে।

(রেজিস্ট্রেশন ঃ প্রাথমিক স্তরের আকুপাংচারিস্টদের রেজিস্টেশনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যাঁরা পুরোপুরি আকুপাংচারের চিকিৎসায় নিযুক্ত তাঁদের রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন।)

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম।। ২

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

জলজ জীবাণুর দখলদারি

জলের তলায় যত জীবাণু থাকে, তাদের যদি দাঁড়িপাল্লায় বসানো হয় তাহলে অন্যদিকে পাল্লা ব্যালেন্স করতে লাগবে অন্তত ২৪০ বিলিয়ন আফ্রিকান হাতি। গল্প নয়, সত্যি। নতুন গবেষণার পর দেখা গেছে, জলের সমস্ত জীবাণু বা মাইক্রোব আর সব জীবের মোট ওজনের ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ অবধি দখল করে। তাহলে সুকুমার রায়ের ষষ্ঠীচরণ ছাড়াও কেউ আছে, যে হাতিদের নিয়ে অনায়াসে লোফালুফি করতে পারে!

কাল্পনিক নয় তাই নাম কাটা

আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে 'ফোর্বস' খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর সব থেকে ধনী মানুষ, পরিবার, ধনী খেলোয়াড়দের নামের তালিকা এতে প্রকাশ করা হয়। মজার ব্যাপার হল, কাল্পনিক চরিত্রগুলির মধ্যেও যারা সবচেয়ে ধনী, তাদেরও একটি তালিকা থাকে এতে। এক সময় সান্তাক্লসও এই তালিকার উপরে থাকত সবচেয়ে ধনী হিসেবে। কিন্তু সারা বিশ্বের সান্তাপ্রেমী শিশুরা প্রতিবাদ করায় তারা সান্তাকে তালিকা থেকে বাদ দেন। প্রতিবাদের কারণ, শিশুরা মনে করে সান্তা কাল্পনিক চরিত্র নয়, সত্যি সত্যি তিনি আছেন।

কচ্ছপদের জন্য সাবওয়ে

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরের কাছে ওসেন রিভ নামক রাস্তা পারাপারের সময় কচ্ছপরা দুর্ঘটনায় বেঘোরে মারা যেত। তাই ওই রাস্তার নিচ দিয়ে জুন্ডালুম লেক পর্যন্ত একটি সাবওয়ে বা সুড়ঙ্গপথ তৈরি করা হয়েছে শুধু কচ্ছপদের অবাধে এবং শান্তিতে চলাচল করবার জন্যে।

ভূত বিক্রি হচ্ছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় জন ভিজ নামে এক ভদ্রলোক রীতিমতো বোতলে ভূত ধরে বিক্রি করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নানা রাজ্যের পেশাদারি ভূত-ধরিয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি তাঁর। ভূত-ভরা বাড়ি, হোটেল, কবর, জাহাজ থেকে ভূত ধরে পুরে ফেলে তারা বোতলে। তারপর সিল করে দেয় মোম দিয়ে। ভূত-ভর্তি বোতল বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মুখটা খুললেই — না, কারও কিছুই হয় না। তবে বাড়িতে ঘটতে থাকে অদৃশ্য কিছু ঘটনা। কারও চাবি হারিয়ে যায়, কারও ফ্রিজের দরজা খুলে যায় আপনা থেকে, কারও ফোন বেজে ওঠে কিন্তু ধরলে কারও সাড়া পাওয়া না। জানলায় ফুটে ওঠে অদ্ভুত হাতের ছাপ। বাথরুম থেকে খুটখাট আওয়াজ আসে। ভূত কিনতে চাইলে ইন্টারনেটে যোগাযোগ করতে হবে— ওয়েবসাইট, http :// aghostirabottle.com¼

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

ছেলে ঃ মা আমার মোবাইলে ব্লু টুথ আছে।

মা ঃ সব্বোনাশ! এক্ষুনি ওটা একবার ডেন্টিস্টকে দেখিয়ে নে।

* * *

প্রচণ্ড শব্দ শুনে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের বিবি ছুটে এল ঃ এত শব্দ হল কিসে!

নাসিরুদ্দিন ঃ আলখাল্লাটা পড়ে গিয়েছিল।

বিবি ঃ একটা আলখাল্লা পড়ার এত শব্দ?

নাসিরুদ্দিন ঃ আলখাল্লার মধ্যে আমিও ছিলাম যে!

* * *

নিতু ঃ মা টাকা দাও আইসক্রিম খাব।

মা ঃ না সোনা, আইসক্রিম খেলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

নিতু ঃ কিছু হবে না মা, আমি সোয়েটার পরে নেব।

* * *

চেকার ঃ দুটো টিকিট কেন, আপনি তো একা।

যাত্রী ঃ এটা আমার রক্ষাকবচ, একটা হারালে অন্যটা ব্যবহার করতে পারব।

চেকার ঃ আর যদি দুটোই হারায়?

যাত্রী ঃ তার জন্যে তো মাস্থলিটা রয়েইছে।

* * *

ফটোগ্রাফার ঃ ডার্করুমে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে?

চাকরিপ্রার্থী ঃ আজ্ঞে, এতকাল রাতে কাজ করেই তো জেল খেটেছি। অভিজ্ঞতা নেই মানে!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণাপত্রটি কী?

২। আমরা দুটি ভাই শিবের গান গাই, একটি দু'টি পয়সা পেলে বাড়ী ফিরে যাই। —এই শিশু-পংক্তি কার লেখা?

৩। জাপানের মুদ্রা 'ইয়েন', চীনের মুদ্রা 'ইউয়ান'— শব্দ দুটির অর্থ এক। সেটা কী?

৪। লাটিন আমেরিকার কোন্ নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন?

৫। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের আমলে কোন্ চৈনিক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক ভারত পরিক্রমা করেন?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। [illegible]

২। যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

৩। গোলাকার বস্তু।

৪। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

৫। ফা-হিয়েন (FAXIAN)।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি এবং কেন্দ্র সরকার

শ্রীনগরে জনতা পুলিশকে মারছে।

যোগিন্দর সিং

যখনই খবরের কাগজের পাতায় ইদানীং চোখ রাখি তখন দেখতে পাই শ্রীনগরের রাস্তায় অসহায় এক নিরাপত্তাকর্মীকে মাটিতে ফেলে ডজন ডজন উঠতি বয়সের দুর্বৃত্তরা সজোরে লাঠিপেটা করে চলেছে। ওই বেচারা পুলিশটিকে রক্ষা করার জন্য কেউ নেই। নববই-এর দশকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যা অপহৃতা হওয়ার সময় আমি শ্রীনগর পুলিশের আই জি ছিলাম। তখনই দেখেছিলাম পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি দিতে ভারত উগ্রপন্থীদের কাছে কীরকম বেহায়া হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

সোজা পথে যে 'শান্তি' কখনও আসবে না আর তা জেনেও কেন্দ্র সরকার আত্মমর্যাদা, রাষ্ট্রীয় সম্মান বিসর্জন দিয়ে একের পর এক সমঝোতা করে চলেছে দিনের পর দিন। একটা বিশেষ উদাহরণ— কোনও উগ্রপন্থী (টেররিস্ট) সরাসরি সঙঘর্ষে নিহত হলে তার মা-বাবাকে দশ লক্ষ টাকা পুনর্বাসন প্যাকেজ হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। এখানে জিজ্ঞাস্য, তিন লক্ষাধিক হিন্দু-শিখদের ওই উগ্রপন্থীরা বন্দুকের জোরে উপত্যকা থেকে বিতাড়িত করেছে। তারা পথে পথে ক্যাম্পে তাঁবুতে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি চরম দুর্দশায় জীবনযাপন করছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কী করছে? এককথায় উপত্যকা থেকে হিন্দু-শিখদের সমূলে বিতাড়িত ছড্রব্ধড়ুনন্তু ট্রপুন্ধ্রব্দনন্তব্ধ্ল বা উৎখাত করেছে সরকারের কাছ থেকে 'জামাই আদর' প্রাপ্ত উগ্রপন্থীরা। একটা পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক আত্মরক্ষার নিয়মে নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। এক এক বার নিরাপত্তারক্ষীরাও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। তখন দেখা যায় রাজ্য সরকার উগ্রপন্থীদের পক্ষে ওকালতি করতে লেগেছে। বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

যে সকল এলাকায় উগ্রপন্থীদের দাপট ও রমরমা (প্রায় পুরো কাশ্মীর উপত্যকা) সেখানে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে একজন উগ্রপন্থী যদি মারা যায় তখন তার সঙ্গী ও সমর্থকরা বদলা নিতে শুরু করে। অনেক সময়ই দেখা যায় কোনও একটি এলাকায় এক নাগাড়ে ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা বা ৭২ ঘণ্টাব্যাপী এনকাউন্টার চলছে। তাহলে ব্যাপারটা হলো— যে কোনও ভারতীয়েরই আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে, শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকায় মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনী ছাড়া! তখন সংবাদমাধ্যম ও সরকারের কাছে সিকিউরিটি ফোর্সই ভিলেন বা জঘন্য অপরাধী হয়ে যায়, তারাই যেন জম্মু-কাশ্মীরে তাবৎ দুরবস্থার জন্য দায়ী! মিডিয়াতে টেররিস্টদের যেভাবে উপস্থাপন করা হয় তাতেই তাদেরকে ভারত-বিরোধী বক্তব্য প্রদানে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করে। তাহলেই তাদেরকে মিডিয়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তুলে ধরবে। সেইজন্যই বোধকরি লৌহমানবী বলে খ্যাত তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার মন্তব্য করেছিলেন—প্রচারই উপপন্থা বা টেররিজমকে অক্সিজেন যোগান দেয়। এই প্রচারই তাদেরকে জীবন্ত প্রতিচ্ছবির চেয়েও বড় করে তুলে ধরে।

এই সবের নীট ফল হলো, রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে ছাপিয়ে গিয়ে ওই উগ্রপন্থীদেরকে তোল্লা দিচ্ছে। এটা এক অবিসম্বাদিত সত্য যে, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যেন তেন প্রকারেণ জেতাটাই বড় কথা, তার জন্য যদি শয়তানদের কাছ থেকেও (পড়ুন উগ্রপন্থীদের) পুরোমাত্রায় সমর্থন নিতে হয় তাতেও তারা পিছপা নয়।

সর্বসাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। তাদেরকে অনাবশ্যকভাবে একটা কদর্য প্রেম-প্রীতি ও ঘৃণার পরিবেশের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে। তারা টেররিস্টদের অবজ্ঞাও করতে পারছে না। কেননা স্থানীয় (রাজ্য) সরকার তাদের থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে উগ্রপন্থীদেরকে তোষামোদ করে। সেজন্য একজন সাধারণ নাগরিক মনে করে তার সুরক্ষার জন্য সরকার নয়, উগ্রপন্থীরাই যথোপযুক্ত। নেতারাই তো বন্দুকের ছায়ার নীচে জীবনযাপন করে।

সারা পৃথিবীতে কোনও জায়গাতেই মিষ্টি কথায় বা নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ করে সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা যায়নি। সুরক্ষা বাহিনীর কারোরই কোনও কাশ্মীরবাসীর প্রতি কোনও অসন্তোষ নেই। তারা কেবল নিত্য-প্রতিদিন সরকারের নির্দেশ পালন করেন।

যদি কেউ নিরাপত্তাকর্মীদের আক্রমণ করে, তাদের দিকে অনবরত পাথর ছোঁড়ে তাহলে তাদেরকেও উল্টোদিক থেকে দ্বিগুণ গতির প্রতি-আক্রমণ সহ্য করতে হবে।

সন্ত্রাসবাদী বা উগ্রপন্থী নেতাদেরকে শুধুমাত্র 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে অনেকে লঘু করে দেখেন—তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সরকারি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। যেটাকে আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত নজির বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। সামান্যতম ছোটখাটো বিষয়ই কাশ্মীরী উগ্রপন্থীদের পক্ষে রীতিমতো গোলমাল, অরাজকতা বাধানোর জন্য যথেষ্ট। যেমন, অমরনাথের হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য সাময়িক জায়গা দেওয়া নিয়ে উপত্যকায় বসবাসকারী কাশ্মীরী মুসলমান এবং তাদের দোসর উগ্রপন্থী সমর্থকরা কি কম ঝামেলা করেছিল? এছাড়া একজন উগ্রপন্থী বা সন্দিগ্ধ ভাড়াটে সন্ত্রাসবাদী মারা পড়লে তো কথাই নেই। এই ব্যাপারে যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ কাশ্মীরীদেরকে। যেখানে নিত্য নিয়মিত বনধ আর আর কার্ফু লেগে আছে, সেখানে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি বা কোম্পানী বিনিয়োগ করতে যাবার আগে হাজারবার ভাববেন। যে কোনও ভ্রমণপিপাসুই বেড়াতে যাওয়ার আগে দু'বার ভাবতে বাধ্য হবেন। কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তি মানে পাকিস্তানপন্থী রাজনীতিবিদ্‌দের বেকার হয়ে যাওয়া, গুরুত্ব হারানো। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন— যে হুরিয়ত কনফারেন্স নেতাদের জন্য কেন্দ্র সরকার সদা শশব্যস্ত সেই 'হুরিয়ত' অফিসেই পাশে বন্ধনীর মধ্যেই লেখা আছে 'হুরিয়ত' শব্দের অর্থ ফ্রীডম বা স্বাধীনতা। আমাদের ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্য যে ওই হুরিয়ত নেতারা যখন রাজধানী নতুন দিল্লীতে পাক-দূতাবাসে গোপন মিটিং করতে আসেন তখন ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর থাকে। প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের সৌজন্য সাক্ষাৎকারের জন্যে চাতকের মতো অপেক্ষা করেন।

এভাবেই স্বল্প সময়ে রাজনীতিতে এসে মহান বনে যাওয়া নেতারা রাজ্যের (জম্মু-কাশ্মীর) অর্থনীতিকে বিনষ্ট করছেন। যতই উপুড় করে দরাজহাতে নতুন দিল্লী জম্মু-কাশ্মীরে ঝাঁপি ভরে দিক না কেন কাশ্মীর পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রীর বার বার সফর, শান্তিবার্তার আহ্বান, সমস্যা সমাধান করার কথা— সাড়া দেওয়া বা গ্রহণ করার জন্য কেউই এগিয়ে আসে না।

যখন সন্ত্রাসবাদীরা উপত্যকার হিন্দু-শিখ নিধনযজ্ঞে মত্ত, রক্তের হোলিখেলায় উন্মত্ত তখন কেন্দ্রের ভূমিকা শুধুমাত্র নীরব মূক দর্শকের। স্পষ্টভাবে বলার দরকার, এখনও যদি কাশ্মীরের কেউ ভারতবাসী হিসেবে সুখী না হন, তা সে উগ্রপন্থী হোক অথবা তথাকথিত ভদ্র শব্দে বিচ্ছিন্নতাবাদী হন তাহলে তিনি বা তারা স্বচ্ছন্দে পাকিস্তান অথবা পৃথিবীর যে কোনও দেশে এখনই চলে যেতে পারেন।

এই উপরোক্ত বাস্তব অবস্থাটা ভারত সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবেই। গণতন্ত্রের নামে উগ্রপন্থা, সন্ত্রাসবাদ, একতরফা অবাধ হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য ওই লোকেদেরকে ছাড় দেওয়া চলবে না। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রশাসকের সক্ষমতা সঙ্গে পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলা দরকার। যার প্রয়োগ এখনও অনুপস্থিত এবং অদৃশ্য।

লেখক সিবিআই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর

সংবর্ধিত নব-নির্বাচিত সাংসদ তরুণ বিজয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'আমি কখনও কলকাতার ঋণ শোধ করতে পারব না। যতবারই ভাবি ঋণ শোধ করে দিই, ততবারই ঋণ বেড়ে যেতে থাকে। কলকাতা আমাকে অনেক দিয়েছে— মাননীয় যুগলজী, মান্যবর বিমলদা, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়, ভাবে উল্লেখ করেন— অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রাক্তন (প্রয়াত) সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক রামভাও গোড়বলে এবং চতুর্থ সরসঙঘচালক রজ্জুভাইয়ার কথা। যাঁদের প্রেরণায় তিনি সাংবাদিকতা ও পরে রাজনীতিতে এসেছেন। বস্ত্র দিয়ে তরুণ বিজয়কে প্রথমে বরণ করেন প্রবীণ সমাজসেবী এবং রাজনৈতিক নেতা যুগলকিশোর জৈথেলিয়া। তারপর এক এক করে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান তরুণজীকে পুষ্পগুচ্ছ এবং পুষ্পহার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের শেষে ওই সকল ফুল-

পরস্পর প্রতিনমস্কার ও স্বাগত, তরুণ বিজয় এবং যুগলজী।

বড়বাজার লাইব্রেরীর মতো অনেক ব্যক্তি ও সংস্থা আমাকে অকুণ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।"

এভাবেই কলকাতায় গত ১০ জুলাই রাজস্থান পরিষদ, কলকাতা এবং অসোয়াল নবযুবকসভার সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে ভাবাবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সাংসদ (রাজ্যসভা) এবং বিজেপি'র সর্বভারতীয় মুখপাত্র তরুণ বিজয়। শ্রীবিজয় তাঁর এই পর্যন্ত পৌঁছানোর যাবতীয় কৃতিত্ব দেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘের জীবনব্রতী প্রচারক ও কার্যকর্তাদের। বিশেষ মাঝে পাঁচ বছর দাদরা-নগর হাভেলিতে প্রচারক হিসেবে কল্যাণ আশ্রমের কাজ করেছেন। সিন্ধু দর্শন অনুষ্ঠান এবং এবছর প্রথমবার শ্রীনগরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর ১০৯তম জন্মজয়ন্তী পালন সম্ভব হয়েছে। অসোয়াল ভবনে তিলধারণের জায়গা ছিল না। সব বয়সের সবরকম পেশার সঙ্গে যুক্ত কলকাতাবাসী একজন সফল সংগঠক, সাংবাদিক, লেখক ও রাজনৈতিক নেতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাল।

একটু দেরীতে পৌঁছালেও সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। মালা ও অঙ্গ মালা নীলাম করে ছয়হাজার টাকারও বেশি পরিমাণ অর্থ তরুণজী বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজে ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ রামগোপাল গুপ্তার হাতে সমর্পণ করেন। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন যুগলজী, অরুণ মল্লাবত, মোহন পারেখ, বিমল লাট, দুই কাউন্সিলার— মীনাদেবী পুরোহিত এবং সুনীতা ঝাঁওয়ার, রুগলাল সুরানা, মোহন গারোদিয়া প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন রুগলালজী সুরানা। রাজস্থান পরিষদ এদিন সকলকে সহভোজে আপ্যায়িত করেন।

রঙ্গম

খুঁজতে গেলাম তারা, পেলাম একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত

।। অর্ণব নাগ।।

ছবিটাতে আগ্রহের কেন্দ্র-বিন্দু অনেকগুলো। প্রথমত, আলোকচিত্রী অভীক মুখোপাধ্যায় এবার পরিচালকের ভূমিকায়। দ্বিতীয়ত, 'অনুরণন' ও 'অন্তহীন' খ্যাত পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী ছবির অন্যতম প্রযোজক। সবচেয়ে বড় কথা অনিরুদ্ধ এবার তাঁর লাকি 'অ' এবং ছবির এক অক্ষরের টাইটেল ('অনুরণন' ও 'অন্তহীন') ছেড়ে 'একটি তারার খোঁজে'-তেই স্বচ্ছন্দ। তৃতীয়ত, প্রায় বছর তিনেক পরে নায়িকা হিসেবে প্রসেনজিৎ ঘরণী অর্পিতা পাল (চট্টোপাধ্যায়)-এর প্রত্যাবর্তন। আরও অনেক ছোট-খাটো দিক রয়েছে যেমন, 'বং কানেকশানে'র পর নায়ক সায়ন মুন্সী'র অভিনয়, প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান রচনা, ছবিটাতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ব্যাপারটা বাদ দিলে বাকিগুলো বোধহয় তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাই হোক, 'একটি তারার খোঁজে' ছবিটায় সবমিলিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো তারার একসঙ্গে অনুসন্ধান। তবে নির্দিষ্ট একটি 'তারা'র খোঁজ পাওয়াটা বেশ মুশকিলের মনে হয়েছে।

আলোকচিত্রী-র 'সিনেম্যাটোগ্রাফি' অসাধারণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে গল্পের 'আঁট'টা বেশ কম। টুকরো টুকরো ছবি নিয়ে একটা 'কোলাজ' করার চেষ্টা হয়েছে। তবে সেটা 'কোলাজ'-ই থেকে গেছে, নিটোল গল্পে পরিণত হয়নি। তবে এর জন্য শুধুমাত্র পরিচালকই নন, চিত্রনাট্যকার মধুজা মুখোপাধ্যায়ও দায়ী। সব মিলিয়ে 'শেষ হয়েও হইল না শেষ' গোছের একটা ব্যাপার ছবিটাতে থাকলেও প্রচুর ধোঁয়াশা রয়েছে। যার জট ছাড়ানো একজন 'কল্পনাবিলাসী'র পক্ষেও অসম্ভব।

ছবির নায়ক অভিষেক ওরফে অভি (সায়ন মুন্সী) বন্ধু দেবের (রুদ্রনীল ঘোষ) আহ্বানে সুদূর চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসে 'নায়ক' হবার জন্য। এখানে একটা ডায়লগ চিরদিন মনে থাকবে। ছবিতে 'প্রোডাকশন ম্যানেজার'-এর ভূমিকায় অভিনয় করা অরিন্দম শীলের তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী, 'কোথায় অভিনয় করা হোত? ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে?' এর উত্তরে নায়কের সটান জবাব— 'গোবিন্দপুর তো পুরোনো কলকাতার নাম।' কলকাতার একটি পুরোনো বাড়িতে থাকতে শুরু করে সে। বাড়ির মালিক আনন্দবাবু (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) আর তার বোন (তনুশ্রীশঙ্কর)-এর সঙ্গে থাকে তাদের ভাইঝি তরুণী রাণী (অর্পিতা পাল)। রাণীর সঙ্গে গল্পের চরিত্র মেনেই অভি-র প্রেম হয়। এরই মধ্যে সিনেমায় নামবে কি নামবে না এই দোটানায় একটা চাকরি নেয় অভি। তার এই চাকরি প্রাপ্তির সৌজন্যে রয়েছে একটা গুন্ডা, চরিত্রের নাম গঙ্গা (দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য)। বাড়িটার বাসিন্দা এক শেয়ার-ব্রোকারও (বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়)। যাই হোক, অভি বুঝতে পারে চাকরিটা সুবিধের নয়। ড্রাগ পেডলিং, জমি-বাড়ি হাতানো, সুপারি-কিলিং এসব ব্যাপারেই 'পাবলিক-রিলেশনস'-এর কাজ করতে হবে তাকে। গোলমেলে। অভিকে গঙ্গার কবল মুক্ত করতে আনন্দবাবুর আগমন খুব নিঃসাড়ে। এমনকী তাঁর ভূমিকাও স্পষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে কল্পনা করাটাও বেশ কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়েছে। বাড়ির কেয়ারটেকারের কাজে অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বেশ মজার।

ছবি শেষের পরেও একটা জিজ্ঞাসা তাই থেকেই যাচ্ছে। অভিনয়ে প্রত্যেকেই যথাযথ। অর্পিতা মানানসই। ছবিতে তার কারুকে বলতে না পেরে সব কথা রাণীকে জানায়। রাণী প্রথমে 'অভিমানী' হলেও পরে অভি-র পাশে দাঁড়ায়। এদিকে অভি'-কে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন রাণীর কাকা আনন্দবাবু। ছবিতে দেখা যায় গঙ্গাকে গুলি করে খুন করছেন তিনি, তারপর মজুত করা বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে উড়ে যাচ্ছে সেই দু' নম্বরী অফিসের বিল্ডিং। এই অংশটা খুব ডায়লগ ও উপস্থিতি বেশ কম। তাই অবকাশটাও ছোট। সায়ন মুন্সী অসাধারণ। নায়কোচিত চেহারা সঙ্গে চলনসই অভিনয়; মানিয়েছে ভাল। প্রযোজক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী ফের প্রমাণ করলেন তিনি ব্যবসার খাতিরে ছবি 'করেন' না। পরিচালক অভীক মুখোপাধ্যায় পরিচালনা-গুণে আগামীদিনে আরও তুখোড় হয়ে উঠবেন এই আশা করা যেতেই পারে। প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলো নেহাত মন্দ নয়, তবে বর্তমান বাংলা গানের কথার বাঁধা গতের বাইরে যেতে পারেননি তিনি। অনিন্দ্য, চন্দ্রিল, শিলাজিৎ এবং সৌভিক মিশ্রের করা সুর 'অ্যাজ ইউজুয়াল'। অর্ঘকমল মিত্রের 'এডিটিং'-এ বিশেষ কোনও খামতি ধরা পড়েনি। শান যতই রবিঠাকুরের গান করুন, তাঁর গানে একটা অবাঙালি টান এই ছবিতেও ধরা পড়েছে। এই ছবির আরেক গায়িকা শ্রেয়া ঘোষালও 'যথারীতি'।

তবে ছবির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক, অন্ততঃ আমার চোখে এতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যবহার। গোটা ছবিটাতে আকর রবীন্দ্রসঙ্গীত একটিই, শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে 'সখী ভাবনা কাহারে বলে'। অর্পিতার লিপে ছবির চরিত্র অনুযায়ী গানটা অসাধারণ মানিয়েছে। সুমিত্রা সেন না হোক কিন্তু তরুণ মজুমদারের 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া ওই একই রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তার সঙ্গে এটি টক্কর দিতে পারে অনায়াসেই। ছবিতে খোঁজ পাওয়া একমাত্র তারা বোধহয় এটিই। এছাড়াও বিক্ষিপ্ত ভাবে গুনগুন করে আরও দু'টি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে ছবিতে যা বাঙালির ঝোল-ঝাল-অম্বলে রবি-দর্পণকেই প্রতিফলিত করে।

ফিল্ম সমালোচনা ঃ একটি তারার খোঁজে

একটি তারার খোঁজে
অর্পিতা পাল ও সায়ন মুন্সী

শব্দরূপ - ৫৫৫

সাগরিকা প্রামাণিক

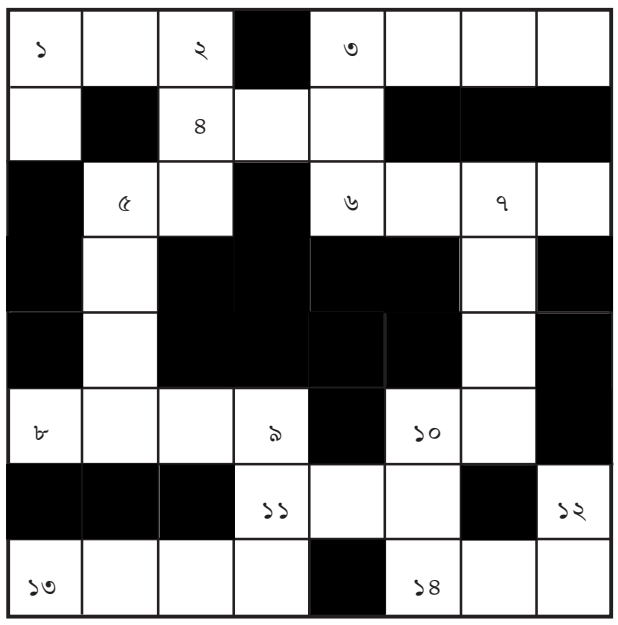

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. রামায়ণে-বর্ণিত এক রাক্ষস-বিশেষ, প্রথম ঘরে জননী, ৩. প্রভাতে জগন্নাথের প্রাতঃরাশ, আগাগোড়া উদ্যান, ৪. রাজা যযাতির এক পুত্র, এঁর মাতা দেবযানী, প্রথম ঘরে ব্রজবুলি তুমি, শেষ ঘরে মঙ্গল, ৫. গৌরীর স্বামী, ৬. এক শ্রেণীর স্বর্গের অধিবাসী—কিন্নরদের মতো ব্রহ্মার ছায়া হতে এদের জন্ম, প্রথম ঘরে ইঙ্গচাবি, ৮. দৈত্য বিশেষ, এই অসুর দিতির পুত্র, বিষ্ণুর অবতার বিশেষ, প্রথম দুয়ে অশ্ব, ১০. প্রজাপতির ন্যায় নিশাচর পতঙ্গ বিশেষ, ১১. দিক অর্থে দক্ষিণ-এর কোমলরূপ, ১৩. জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ১৪. একই শব্দে সরস্বতী, দুর্গাদেবী, রামকৃষ্ণ ঘরণী।

উপর-নীচ ঃ ১. নকুল ও সহদেবের জননী, ২. বুদ্ধি মান, ৩. নাগরাজ, দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ, ৫. কৃষ্ণচন্দন, কদম্ববৃক্ষ, প্রথম দুয়ে বিষ্ণু, শেষ দুয়ে স্নেহের পাত্র, ৭. মহাভারতে শল্যের পুত্র, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিনে অভিমুন্যর হাতে নিহত হন, ৯. কুলগাছ, শেষ দুয়ে মূল্য, ১০. সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ১২. ভীম ও দুর্যোধন এর অস্ত্র।

● ৫৫৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ আগস্ট, ২০১০ সংখ্যায়।

কৃপা হি কেবলম্ রামকৃষ্ণ শরণম্

(১১ পাতার পর)

তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তবেই সব সমস্যার সমাধান। সংসারীর জন্য ঠাকুরের একমাত্র প্রেসক্রিপশন। গল্পকার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেব বলছেন—"সরল বিশ্বাসে কি না হয়। গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশনে শিষ্যরা যে যেমন পারে, উৎসবের আয়োজন করেছে। একটি গরীব বিধবা সেও শিষ্যা। তার একটি গরু আছে। সে একঘটি দুধ এনেছে।

গুরু মনে করেছিলেন যে দুধ-দধির ভার ওই মেয়েটি নেবে। বিরক্ত হয়ে সে যা এনেছিল ফেলে দিলে আর বললে— তুই জলে ডুবে মরতে পারিস নি? মেয়েটি এই গুরুর আজ্ঞা মনে করে নদীর ধারে ডুবতে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন;আর প্রসন্ন হয়ে বললেন— এই পাত্রটিতে দধি আছে, যতই ঢালবে, ততই বেরুবে, গুরু সন্তুষ্ট হবেন। এবং সেই পাত্রটি দেওয়া হলে গুরু অবাক। তার সমস্ত বিবরণ শুনে নদীর ধারে এসে মেয়েটিকে বললেন— নারায়ণকে যদি আমাকে দর্শন না করাও তবে আমি এই জলেতে প্রাণত্যাগ করব। নারায়ণ দর্শন দিলেন, কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। মেয়েটি তখন বললে, প্রভু গুরুদেবকে যদি দর্শন না দেন আর তাঁর শরীর যদি যায় তো আমিও শরীর ত্যাগ করব, তখন নারায়ণ একবার গুরুকে দেখা দিলেন।" এই 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর। গুরু রামকৃষ্ণের এই কথাটাই ভবিষ্যতে ধ্বনিত হয়েছে শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাক্যে— "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। নিজের ওপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস। ইহাই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়।"

ঠাকুর গুরুর প্রতি বিশ্বাসেরও একটা দিঙ্‌নির্দেশ দিয়েছেন— 'ভক্ত হবি। কিন্তু বোকা হবি কেন?'

ভক্ত রাজেন্দ্র-গৃহে কীর্তনানন্দে মত্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণ। অন্তঃপুরে রাজেন্দ্র-জায়া তারাসুন্দরী ঠাকুরের সেবার ভার ছেড়েছেন বোন শ্যামাসুন্দরীর ওপর। শ্যামা-পুত্র মনোমোহনের ভাষায়— "আমার স্নেহময়ী জননী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন ও ঠাকুরকে খাওয়াইলেন।" খাবার সময় সবাই উপস্থিত। শুধু অশৌচ বলে আলাদা পংক্তিতে খেতে বসেছেন ব্রহ্মানন্দ। বৃটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক রাজেনবাবু তাঁর 'এলিট সোসাইটি'র গৌরব গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাঝেমধ্যেই ছুটে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরের পদধূলি তাঁর গৃহ-বিলাসকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
১। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত-শ্রীম
২। চরণ চিহ্ন ধরে—নির্মল কুমার রায়
৩। ঋষিণ মিত্র, প্রতিষ্ঠাতা, ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ ।

সিপিএমের ক্ষয় অব্যাহত

(৫ পাতার পর)

জনবিক্ষোভকে দমন করে সিপিএম-এর এবং বামফ্রন্টের বারোটা বাজিয়েছেন।

তাইতো আজ রেজ্জাক মোল্লার মতোন কৃষকনেতা রাজনীতি ছাড়তে চান? ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বলেন— শিল্পায়নের নামে রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে আনা হয়েছে। বুদ্ধ বাবুর জেলা সফর ব্যর্থ বুদ্ধ বাবুর গ্রহণযোগ্যতা নেই। আর এস পি-ও সরাসরি বলেছে— "মহারাষ্ট্র গুজরাটের মতো শিল্পায়ন হবে না। পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প তথা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা উচিত ছিল। সিপিএম-এর জন্যই বামফ্রন্ট ধ্বংস হয়ে গেল।" কিরণময় নন্দ বলেছেন— "সরকারের মৃত্যু হয়েছে—ডেথ সার্টিফিকেট জনগণ হাতে গুঁজে দিয়েছে।" সিপিআই বিধায়ক কামাখ্যা নন্দন দাস মহাপাত্র বিধান সভায় বলেছেন— 'জনদরদী বাজেট-এর নামে জনগণকে ধাপ্পাবাজি দেওয়া হয়েছে।" তবুও সিপিএম মুখিয়ারা— বুদ্ধ-নিরুপম-বিমান-বিনয়— এই দুষ্ট চতুষ্টয়ের চৈতন্য হবে না—ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছে। পার্টিকে ১৯৫২-এর অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এঁদের কার্যকলাপ কে রোধিবে হায়। পার্টি বসে গেছে—এঁরা না-সরলে পার্টির দাঁড়ানো সম্ভব হবে না।

ফিরে এসো শ্যামাপ্রসাদ

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য

স্বস্তিকা দপ্তরে একটি ফোন বুঝিয়ে দিয়ে গেল আমরা কোন্ রাজত্বে রয়েছি। আগামীদিনে কি হবে। দিন যে ভাবে চলছে কলকাতাকে ঢাকা শহরে রূপান্তরিত করতে আর বেশিদিন নেই। ঢাকা যশোর খুলনাতে যেভাবে হিন্দুরা একদিন নির্যাতিত অত্যাচারিত হয়ে সবছেড়ে পালিয়ে এসেছিল সীমান্তের এ পারে, ঠিক সেই ভাবে এপারেও শুরু হয়েছে—ভয় দেখানোর পালা। মুর্শিদাবাদ মালদা দঃ ২৪ পরগণাতে পুরোপুরি অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে। সেই রেশ শহরেও প্রবেশ করছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি এখন পুরোপুরি মুসলমানদের তোয়াজ করতে নেমেছে। কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলও এই নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। মুসলিম তোয়াজে কে কাকে হারিয়ে প্রথম হবে সেই নাটক এখন আমরা প্রত্যহ দেখছি। মুসলমানকে তোয়াজ করে ক্ষমতা দখল আজকের নয়। ১৯২৩-এর নির্বাচনে বাংলা কাউন্সিলে ১৩৮ জন সদস্যের মধ্যে সাধারণ আসন সংখ্যা ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন-৪৬। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের সঙ্গে (১৮ ডিসেম্বর ১৯২৩) এক চুক্তি করলেন। তিনি কথা দিলেন— স্বরাজ লাভের পর আইন পরিষদে সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে। মিউনিসিপ্যালিটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতিতে তারা পাবে ৬০ শতাংশ আসন। চাকরির ৬৫ শতাংশ তাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। আপাতত কলকাতা কর্পোরেশনে তাদের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা হবে, মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা হবে ও ঈদের সময় গোহত্যায় বাধা দেওয়া হবে না। এই চুক্তির ফলে সেবছর নির্বাচনে স্বরাজ দল অনেক আসন জিতে ছিল। এমনকী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশন বিলের সমর্থন আদায় করেন ন' বছরের জন্য সাম্প্রদায়িক ভোট দান প্রথা মেনে নিয়ে।

মুসলিমরা একটা কথা বোঝে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে তারা হিংসার পথে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার শক্তি ধরে এবং হিংসার পথ নিলেই সরকার কি হিন্দুরা সেদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। হিংসা হবে 'an effective mode of political action.' দাঙ্গা মুসলিমদের হাতে এক নতুন রাজনৈতিক তলোয়ার হয়েছিল বহুপূর্বেই। কলকাতার মতো বহুজন অধ্যুষিত শহরে ছোট ছোট গলি। বস্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের সহবাস, বেকার, সমাজবিরোধী ব্যক্তির আধিক্য— এসব বুঝেই স্যার আবদুর রহিম এর কার্যকাল ১৯২৫-এ শেষ হতেই তিনি রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম রাখার জন্য দাঙ্গা বাধানোর পরিকল্পনা করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতার দাঙ্গা তারই পরিকল্পনার ফসল। লীগের আলিগড় অধিবেশনে লীগ নেতা আবদুর রহিম বলেন, মুসলিম অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠিত সংগ্রামের সময় এসেছে। হিন্দুরা বৃটিশ ও মুসলিম উভয়ের শত্রু। বৃটিশরা মুসলিম দাবি মেনে নিলে চিরদিনের জন্য মুসলিম বন্ধুত্ব পাবে। তার প্রথম কাজ হলো উপনির্বাচনে কাউন্সিলে ঢুকে নির্বাচনী বিধান সংশোধন, যাতে মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা মেলে। বিধান পরিষদের সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের আপত্তি নাকচ করে রহিমের সংশোধনী পাশ হয়। এতেও কিন্তু তিনি খুশি হননি। মুসলিম সংবাদ মাধ্যমে বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ান।

তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল এটা রহিমের রাজনৈতিক জুয়ার অঙ্গ। ১৯২৬ এর ২৯ এপ্রিল তাই দুঃখ করে লিখেছিল, 'How long the public ask, will it take to ensure the Safe return of Sir Abd-ur-Rahim's thirty followers at the next elections? Is not the Sub-merging of nationalism by communalism yet complete?'

হিন্দুদের দৃঢ়বিশ্বাস হয় আবদুর রহিমের যোগ্য জামাতা সুরাবর্দি ছিলেন নাটেরগুরু। তাই যখন যতীন্দ্রমোহন সুরাবর্দীকে ডেপুটি মেয়র পদে থাকতে দিলে আনন্দবাজারের মতো পত্রিকাও তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অবশ্য সেসময় আনন্দবাজার পত্রিকা জাতীয়বাদী পত্রিকা ছিল। কিন্তু এত তোষণ করেও মুসলিম অত্যাচার রোধ করা যায়নি। সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন তোমরা দুটো আলাদা জাত, শক্তির জন্য সোজা গণতান্ত্রিক পন্থা নিলে তোমরা হারবে। তাই মুসলমানরা গণতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাস করে না। তাদের চাই সম্পূর্ণ অধিকার। এ কারণেই শক্তির প্রয়োগ। প্রথমে ভয় তারপর অত্যাচার এবং শেষে কর্তৃত্ব দখল।

মুসলমানরা আজ যে পন্থা নিয়েছে তা হলো ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে গ্রাস করা। অনুপ্রবেশ এবং উগ্রপন্থা একটা কৌশল মাত্র কিন্তু অন্য একটি বড় কৌশল চলছে পর্দার আড়ালে। ভারতীয় মিডিয়া, প্রচারমাধ্যম এবং সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করা। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু আজ তাই চলছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় কোনও মিডিয়াই আজ মুসলিমদের কোনও দোষ দেখতে পায় না। আর ভারতীয় জনমানসে মুসলমানদের একটা প্রভাব রয়ে গেছে কেন তা আজও রহস্যাবৃত। যে মানুষটি পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, ঘটি বাটি খুইয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে তিনি মুসলমান প্রেমী হয়ে যান কোন্ যাদুবলে তা বোধগম্য নয়। উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়াতমন্ত্রী প্রশান্ত সুর। এখন প্রশ্ন, পূর্ববঙ্গে নির্যাতিত হিন্দুরা যারা আজ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করছেন তারা এবার অত্যাচারিত হলে কোথায় যাবেন অথবা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান প্রেমী হিন্দুরা কোথায় আশ্রয় নেবেন? সীমান্তের গ্রাম আজ হিন্দুশূন্য। সেখানে আজ আশ্রয় নিয়েছে বাঙলাদেশী মুসলমানরা। রাজনৈতিক দলগুলির সৌজন্যে ইতিমধ্যেই তারা রেশনকার্ড, ভোটার কার্ড সব পেয়ে রে গেছে। এই মানুষগুলি আজ সীমান্ত এলাকা থেকে শহরে প্রবেশ করেছে। পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব এখন তাদেরই হাতে। তাই গ্রাম শহরে যেখানেই রাজনৈতিক লড়াই হচ্ছে, খুন হচ্ছেন কিন্তু হিন্দু নেতারা। মুসলমানেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিরোধীপক্ষের হিন্দু নেতাদের খতম করার কাজে নেমেছেন। এটা একটা কৌশল। আমরা দেখছি রাজনৈতিক লড়াই চলছে এবং তাতেই দলের নেতারা খুন হচ্ছেন। দঃ ২৪ পরগণায় রাজনৈতিক লড়াইয়ের কৌশলে বিভিন্ন দলের হিন্দু নেতাদের খুন হতে হচ্ছে। আগামীদিনে যাতে সমস্ত দলেরই পরিচালন ক্ষমতাটা মুসলিম নেতাদের হাতে থাকে। তখন মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি জানাতে যাতে সুবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি চোখ বুজে থাকেন তবে আমাদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। আজ তো শ্যামাপ্রসাদের মতো অসম সাহসী বুদ্ধিমান এমন কেউ নেই যিনি আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। আমাদের নিজেদেরই তাই প্রস্তুত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে যে কোনও উপায়ে নিধন করাও ধর্ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একারণেই ধর্মযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত।

মুসলিমরা একটা কথা বোঝে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে তারা হিংসার পথে ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার শক্তি ধরে এবং হিংসার পথ নিলেই সরকার কি হিন্দুরা সেদিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়। হিংসা হবে 'an effective mode of political action.'

বিকল্প শক্তির উৎস সন্ধানে - সৌরশক্তি

(৯ পাতার পর)

কোটি বৎসর।

(গ) সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ঃ সর্বাধিক ১৫২১০৬০০০ কি.মি. (৪ঠা জুলাই) এবং সর্বনিম্ন ১৪৭১০৩০০০ কি.মি. (৩ রা জানুয়ারী)

(ঘ) সূর্যের ব্যাস ঃ ১৩৯২০০০ কি.মি. (পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯.৩ গুণ)।

(ঙ) সূর্যের আয়তন ঃ ১.৪১২×১০^{১৮} ঘন কি.মি. (তের লক্ষ পৃথিবীর চাইতেও বেশী)

(চ) সূর্যের ভর ঃ ১.৯৯×১০^{৩০} কি.গ্রাঃ (পৃথিবীর তুলনায় ৩৩৩৪০০ গুণ বেশী)

(ছ) সূর্যের গড় ঘনত্ব ঃ ১.৪১ গ্রাঃ/ঘন সেমিঃ

(জ) সূর্যের কার্যকারী তাপমাত্রা ৫৭৪০° কে।

(ঝ) সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে নিঃসৃত শক্তি ঃ ৩.৮৬×১০^{২৬} জুল।

(ঞ) সূর্যের উজ্জ্বল্য ঃ ৩.১৭×১০^{২৭} কেন্ডেল।

(পূর্ণ চন্দ্রের তুলনায় প্রায় ৪ ১/৪ লক্ষ গুণ বেশী)।

(ট) সূর্যের অভিকর্ষজ বল ঃ পৃথিবীর আটাশ গুণ।

(সূত্র ঃ সৌর শক্তি—আনন্দ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রায় দশ কোটি মাইল পথ মাত্র আট নয় মিনিটে অতিক্রম করে সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এই পথের অধিকাংশই ফাঁকা। কোন মাধ্যম নেই। ফলে পরিবহণ ও পরিচালন পদ্ধতিতে এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সূর্যের কিরণ তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গরূপে বিকিরণ পদ্ধতিতে এসে পৌঁছায় আমাদের পৃথিবীতে। এই কিরণে থাকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন শক্তির আলো। এই দৃশ্য আলো আবার রামধনুতে দেখা সাতটি রঙের মিশ্রণ। যেমন বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।

সূর্য থেকে বছরে প্রায় ১.২×১০^{২৪} জুল পরিমাণ শক্তি কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে প্রবেশ করে। এই আপাতত শক্তির শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ মাত্র ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। শতকরা তের ভাগ কিরণ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়। আর বাকিটা বায়ুমণ্ডলের মেঘপুঞ্জ, ধূলিকণা ও গ্যাস অণু দ্বারা বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় মহাশূন্যে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রকৃতজাত প্রায় সমস্ত শক্তির উৎসই হল সৌরশক্তি। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে যেমন জোয়ার ভাটা থেকে উদ্ভূত শক্তি যার মূলে রয়েছে চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ বল। প্রায় সমস্ত জীব ও বৃক্ষের জীবনী শক্তির উৎসস্থল সৌরশক্তি।

সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল সৌরশক্তিকে দেহে সঞ্চিত করে রাখে। সঞ্চিত এই শক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়ায় এবং বাকিটা সঞ্চিত থাকে জীব দেহে। ঝড় ঝঞ্ঝা, ভূমি-কম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সব জীব দেহ এবং উদ্ভিদ মাটিতে চাপা পড়তে পারে। এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই সব জৈব পদার্থগুলির মধ্যে অতি ধীরে ধীরে চলতে থাকে রাসায়নিক পরিবর্তন। এর ফলে সৃষ্টি হয় কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এরা জীবাশ্ম জ্বালানী নামে পরিচিত। এই জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে আজকের সভ্যতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক সভ্যতার সঞ্চিত সৌরশক্তি।

এরপর আসা যাক বায়ুশক্তিতে। আমরা জানি যে, বায়ুপ্রবাহের কারণ হলো বিভিন্ন স্থানে বায়ুচাপের তারতম্য। বায়ু উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ুচাপের এই পার্থক্য ঘটে আবার ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতার তারতম্যের জন্য। কারণ আমরা দেখেছি সূর্যরশ্মির তীব্রতা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র সমান নয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় নিয়ত বায়ু আয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু। এছাড়া আছে সাময়িক বায়ু যেমন, স্থল বায়ু, সমুদ্র বায়ু, মৌসুমী বায়ু ইত্যাদি। সেগুলি সৃষ্টির কারণ দিনের বিভিন্ন সময়ে ও বছরের বিভিন্ন ঋতুতে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য। কাজেই বায়ুশক্তি প্রকৃতপক্ষে সৌরশক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিলিত ফল। মধ্যযুগে বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই বায়ুশক্তিই ছিল বড় বড় শিল্পে যান্ত্রিক শক্তির প্রধান উৎস। এছাড়াও এই বায়ুশক্তি পালতোলা নৌকা এবং জাহাজে ব্যবহৃত হত।

আবার নদনদী প্রভৃতি জলধারার অন্তর্নিহিত শক্তি হলো সৌরশক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিলিত ফল। সৌরশক্তি নদনদী ও সমুদ্র জলকে বাষ্পীভূত করে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করছে। এই জলীয়বাষ্প আবার বৃষ্টি বা তুষার হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসে নদনদী বা হিমবাহের রূপ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। নদনদীর এই স্রোত থেকে উৎপন্ন করা হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুতের মতো তাপবিদ্যুতেও সৌরশক্তির অবদান কম নয়, এ বিষয়ে আগেও আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জ্বালানী হলো কয়লা, গ্যাস কিংবা তেল, আবার আমরা জানি জ্বালানী তেল অথবা কয়লার সঞ্চিত শক্তি হলো সৌরশক্তির রূপভেদ।

সমুদ্র জলের উষ্ণতা ও লবণাক্ততার পার্থক্য ইত্যাদি থেকেও বর্তমানে বিদ্যুৎ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সবেরও কারণ হলো সৌর শক্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে শক্তির যে বহুমুখী প্রবাহ চলছে তার উৎস প্রধানত একটিই — তা হলো সৌরশক্তি।

Swastika
19 July - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

গত ১১ জুলাই মহাজাতি সদনে শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তীতে স্বস্তিকা-র শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যার উন্মোচন করছেন মোহন ভাগবত এবং নীতিন গডকরি। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

অচেনা জীবনের স্বরলিপি লেখা রবে..

অর্ণব নাগ।। মহাজাতি সদনের দেওয়ালে ব্যারিটোন ভয়েসটা সবেমাত্র গোঁত্তা খেতে যাবে, অমনি পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল 'স্বরলিপি লেখা রবে'। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখি, একটা মিচকে চেহারার লোক। একটু চটে গিয়েই জিজ্ঞেস করলুম —'এটা কি গানের আসর বসেছে না কি? যে স্বরলিপি লেখা রবে?' লোকটা কেমন মিইয়ে গেল। মিনমিন করে বলল— 'গান না হোক, স্বরলিপি তো বটেই। চিরদিন থাকবে।' ফের জিজ্ঞেস করতে হলো— 'কেমন করে?' লোকটির প্রত্যুত্তর— 'এই দেখ না কেন এবার বাঁধ ভাঙল বলে। এতকাল কেবল শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক চর্চা-ই চলে এসেছে। এবার শুরু হবে পারিবারিক চর্চা। এই দেখলে না শ্যামাপ্রসাদের ছোট কন্যা সবিতা চ্যাটার্জীকে। ভদ্রমহিলা অসুস্থ। তবু কলকাতাবাসীর জন্য মুখটা তো খুললেন। বললেন, দেশের উন্নতিতে যুবকদের যোগদান যদি ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যায় তবেই তাঁর বাবার আত্মা শান্তি পাবে। শ্যামাপ্রসাদের স্বরচিত বই দেখলে না! 'Awake Hindusthan'। এর পরেও বলবে মহাজাতি সদনে 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রিসার্চ ফাউন্ডেশন' এবং 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মারক সমিতি' আয়োজিত ১১ জুলাই-এর অনুষ্ঠানের স্বরলিপি লেখা থাকবে না? জানো, আজকে শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে মোহনজী, নীতিন গডকরিমশাই গেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক চর্চা একবার শুরু হলে কি খেলটা জমে, খালি দ্যাখো না একবার!' ফাঁপরে পড়ে কিছুটা কিন্তু কিন্তু করে বললাম, 'তাতে কি হলো? শ্যামাপ্রসাদের বলিদানের মর্ম বাঙালি আর কাশ্মীরিরা কি বুঝবে? এদের বাঁচাতেই তো শ্যামাপ্রসাদের আত্মত্যাগ।' লোকটা উৎসাহিত হলো— 'আরে বুঝবে না মানে? আলবাৎ বুঝবে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি কে কে গাঙ্গুলিমশাই কি বললেন শোনোনি?— 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। শ্যামাপ্রসাদের আত্ম-বলিদানের পর এবারই প্রথমবার তাঁর স্মরণে সভা হয়েছে কাশ্মীরের শ্রীনগরে, বেজে উঠেছে জাতীয় সঙ্গীত। তেমনি বাঙালিকেও বুঝতে হবে শ্যামাপ্রসাদের জন্যই আজ তারা ভারতে রয়েছে, জীবন-যাপনে স্বাধীনতার নোনতা স্বাদ উপভোগ করতে পারছে।' ততক্ষণে লোকটার বেশ জোশ এসে গেছে। 'পারিবারিক শ্যামাপ্রসাদকে জানতে পারলে দেখবে লোকটা একটা সামান্য পি এইচ ডি, কোনও ডি লিট-ফি লিট-এর ধার ধারেনি। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আধুনিক রূপ এখন দেখছো, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বাপ কা বেটা তেত্রিশ বছর বয়সী উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। তার ব্যারিস্টারি যুক্তিতে নেহরু কোন ছার, শরৎ বোস পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কং আর কম্যুরা যে বাঙালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে এতটাকাল খেলা-ধুলো করে এসেছে, পারিবারিক শ্যামাপ্রসাদ তাদের মুখে চুন-কালি লেপে দিয়ে ঝামা ঘষে দেবে। বুঝলে কিছু?' বলতেই হলো— 'মোটামুটি বুঝলাম। কিন্তু এই যে কালো পতাকা-টতাকা দেখানোর একটা যে চেষ্টা হলো এদিন, সেটা কি আমাদের পক্ষে খুব ভাল বিজ্ঞাপন হলো?' লোকটা একটু গলা-খাঁকরি দিল। সেটা কাশির দমক না হাসি সামলাল বোঝা গেল না। বলল—''আসতে দাও না। ল্যাজে তো পা পড়েছে। আফজল গুরু-কে নিয়ে কংগ্রেসের কুকীর্তিটা মোক্ষমভাবে ফাঁস হয়ে গেছে। তাই গডকরির ওপর কংগ্রেসী আর তাদের চামচে প্রেসগুলোর এত রাগ। দেখছো না এগিয়ে থাকা, এগিয়ে রাখা (ওঠা অবশ্য পেছনের দিক দিয়ে) একটা টিভি চ্যানেলের গোটা তিনেক সাংবাদিক অনুষ্ঠান চলাকালীন কি 'সিন-ক্রিয়েট'টাই না করল। সবাই জ্বলছে বুঝলে? শ্যামাপ্রসাদের পারিবারিক কথা জানতে পারলে এত গুণীজনের হদিশ পাবে, বঙ্গদেশের উন্নতিতে তাদের ভূমিকার কথা সব্বাই জানতে পারলে এদের সমূহ বিপদ। শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দেওয়ার কাজটা এত সযত্নে, কং-কম্যু আর মিডিয়া করেছে, পাবলিক এখন যদি তাঁর প্রপিতামহ বিশ্বনাথ, পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদ বা পিতা আশুতোষের কথা জানতে পারে তবে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তারা ভয় পাবে না তো কারা পাবে? শুনলে না, গান্ধী-নেহরু পরিবারের কুকীর্তি সব মাটির নীচে। কে জানে মুখার্জী পরিবারের গৌরবগাথা উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি গান্ধী-নেহরুর কু-কীর্তিও না প্রকাশ হয়ে পড়ে!' থম মেরে বসেছিলাম। এবার একটু উৎসাহিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম 'কিন্তু শুধু লেকচারে কি কাজ হবে।' লোকটা হাসল— 'কে বলেছে হবে? মোহনজীর কথাটা শুনলে না। হাজার বছরের পরাধীনতায়ও আমরা হারিনি। হেরেছি '৪৭-এ। এবার জিততে হবে, তার জন্য শুধু লেকচার শুনে লাভ নেই, কাজ করতে হবে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করো; মহাজাতি সদন, এর উদ্যোক্তা নেতাজী, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন রবীন্দ্রনাথের। দেখছো নিশ্চয়ই মহাজাতি সদন চত্বরেই পারিবারিক শ্যামাপ্রসাদের এক্সজিবিশন। ভেতরে রয়েছে নেতাজীর-টা। দু'য়ের মাঝে শুধুই প্রশস্ত রাস্তা। কোনও ব্যারিয়ার নেই। বক্তাদের সব কথাতেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাদ দিলে ওই তিনজন মানে নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ আর শ্যামাপ্রসাদের নাম। নেতাজী-শ্যামাপ্রসাদের কাজে কোনও বিরোধ নেই বুঝলে। এটা দেখেই ভয় পাচ্ছে সেকুলারবাদীরা। দুই দেশপ্রেমোত্তম ব্যক্তিকে আলাদা করার চেষ্টাটা বুঝি ভেস্তে গেল! কিন্তু জেনে রাখো ভারত আবার জাগছে। শুনলে না, জাপানের বিজ্ঞানীরা জিজ্ঞেস করছে, ভারতের ছেলেদের মধ্যে ম্যাথামেটিকসের জিন আছে কিনা!' চোখ ঝাপসা হচ্ছে, লোকটাও যেন অদৃশ্য, সামনে কেবল স্বরলিপির আঁকি-বুঁকি।

দিল্লীর শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থায় পুরনো ও জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়া শ্যামাপ্রসাদের জীবিতাবস্থার অনেক দুর্লভ সাদা-কালো ছবি ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয়ের উদ্যোগে কম্পিউটারের মাধ্যমে সুসংস্কৃত করে বড় আকারে বাঁধিয়ে অবারও ৭৭, আশুতোষ মুখার্জী রোডের সংগ্রহশালায় পুনঃস্থাপন করা হয়েছে প্রদর্শনীকক্ষে। গত ১১ জুলাই সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আর এস এস প্রধান মোহনরাও ভাগবত এবং বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি। ঘুরে ঘুরে সেই প্রদর্শনী দেখেন মোহনজী, নীতিন গডকরি এবং অন্যান্য বিজেপি নেতৃবৃন্দ এবং সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় ও প্রাদেশিক কার্যকর্তাগণ।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com